

দিন দুপুরে

লীলা মজুমদার



সিগনেট প্রেস কলিকাতা ২০

দ্বিতীয় সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৬৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট ও ছবি

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস

৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

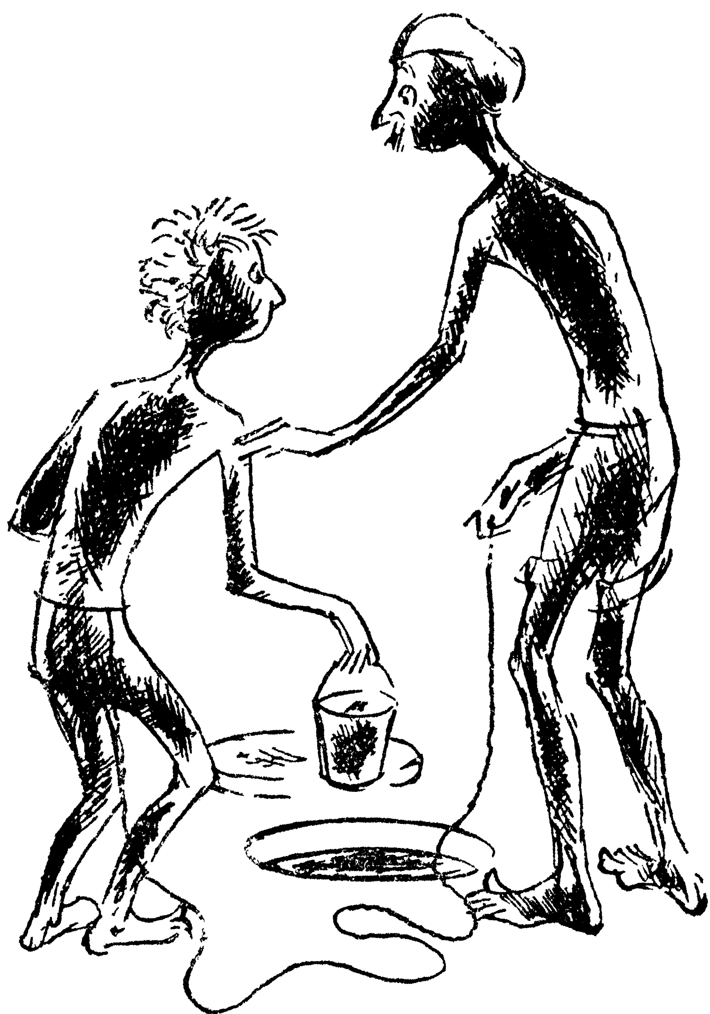
দাম আড়াই টাকা


রঞ্জন
ও
কমলাকে


সূচিপত্র



কোন সকালে কল্দু কদ্দিন দেখেছে রাস্তার মধ্যিখানে লোহার গোল ঢাকনি খুলে খ্যাংরাকাঠির মতন গোঁফওয়ালা লোক, ছোট বালতি হাতে দড়িবাঁধা কালো ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে বসে থাকে। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কাদার ছিটে—অমুদা যখন দাড়ি কামাতো না তখন তাকে যেমন দেখাতো সেই রকম দেখায়। ছোট ছেলেটা হয়তো ওর ভাইপো হবেও বা। ওর নাম হয়তো ছক্কু, ওর গায়ে মোটে কাপড় নেই, কিন্তু কানে সোনালি রংয়ের মাকড়ি, গলায় মাদুলি বাঁধা। বুবু বলে নাকি সত্যি সোনার নয়; ওরা গরিব কিনা, খেতেই পায় না, ও পেতলের হবে। কল্দু আর বুবু ছাড়া ওদের কেউ দেখেই না। সামনে দিয়ে দেবরঞ্জন মামা, অমুদা, ননিগোপালরা



সবাই চলে যায়, তাড়াতাড়ি কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ি—ওদের চোখেই পড়ে না। কিন্তু কল্‌দু দেখেছে লোকটা মাঝে মাঝে বালতি

টেনেটুনে উপরে তোলে, সেটা থাকে কাদায় ভরা; সেই নোংরা কাদা রাস্তাব পরিষ্কার ডাস্টবিনে ঢেলে আবার বালতি নামিয়ে দেয়। কাদা ছাড়া কখনও কিচ্ছু ওঠে না। কত কি তো হারিয়ে যায়, কিন্তু ওর ভিতর থেকে কিছু কক্ষনও বেরোয় না। দাদা বলেছিলো বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে ওর সোজাসুজি যোগ আছে, ওর ভিতর কুঁদো কুমির ছেলেপুলে নিয়ে হুমো দিয়ে থাকে, কই বালতিতে তার ডিমটিম তো কক্ষনও পাওয়া যায় না!

দাদার ফাউণ্টেন পেন হারিয়ে গেলো: চিনুদার কবিতার খাতা হারিয়ে গেলো; বদ্যিনাথের নতুন চটি হারিয়ে গেলো গোরা-মামার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে: সেইদিনই আবার পাল সাহেবের ছাতাও কোথায় হারিয়ে গেলো; ছোড়দির চুড়ি ড্রেনের ভিতর তলিয়ে গেলো. এতো সব গেলো কোথায়? তার কিচ্ছু মোটে কোথাও পাওয়াই গেলো না। অথচ সেই লোক দুটো কতো কাদা ওঠালো!

রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন, বুবু পড়ে না, কলু পড়ে। —রোজ রাত্রে, রবিবার ছাড়া। কলু কত সময়ে সেই দু'জনের কথা ভাবে. সন্ধি-সমাস গোল হয়ে যায়. মাস্টারমশাই রেগে কাঁই! বলেন. "ওরে আহাম্মুক! আমার ছেলে বিধুশেখর তোর অর্ধেক বয়েসে তোর তিন গুণ পড়া শিখতো!"

ছেলে বটে ঐ বিধুশেখর! তার কথা শুনে শুনে কলু তো হেদিয়ে গেলো। সে কক্ষনও হাই তুলতো না. কক্ষনও চেয়ারে মচমচ শব্দ করতো না, কক্ষনও চটি নাচাতো না। প্রথম প্রথম কলু ভাবতো,

তা হলে সে বোধ হয় এতো দিনে নিশ্চয় মরে গিয়েছে। কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন সে নাকি বিয়ে করে কোথায় পোস্টমাস্টারি করে।

একদিন বদ্যিনাথ কতকগুলো শাদা বড়ি এনেছিল। বলেছিল ওগুলো নাকি ছানা বাঁদরের রস দিয়ে তৈরি, কোন কবিরাজের কাছ থেকে এনেছে। নাকি অনেক দিন আগে মানুষদের পূর্ব-পুরুষরা বাঁদর ছিলো, সেই বাঁদুরে রক্ত মানুষের গায়ে আছেই আছে, ঐ আশ্চর্য বড়ি খেলে তাদের আবার বাঁদর হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—ঐ এক রকম ধাত কিনা! কলু তার দুটো বড়ি চেয়ে রাখলো, কাজে লাগতে পারে।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বহুদূরে, উনি তবু রোজ ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতেন। কি শখ বাবা পড়াবার! মাঝে মাঝে দাদারা এসে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়তো, কলুকে শব্দরূপ মুখস্থ করতে হতো। কলুর চোখ বুজে আসতো, মাথা ঝিমঝিম করতো, আর দাদারা শুধু কথাই বলতো। কলু দড়িবাঁধা ছেলেটার কথা ভাবতো, আর শুনতে পেতো পাশের বাড়ির ছোট ছেলেরা খেতে বসে হল্লা করছে। আর ভাবতো, এমন অবস্থায় পড়লে মাস্টার-মশাইয়ের ছেলে সেই বিধুশেখর কি করতো!

এক এক দিন যেই পড়া শেষ হয়ে আসতো, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতো। মাস্টারমশাই হয়তো বাড়িতে ছাতা ফেলে আসতেন, আটকা পড়তেন।

কলু ব্যস্তভাবে বলতো, "ছাতা এনে দিই, ভালো ছাতা?"

মাস্টারমশায় বলতেন, "না না, থাক, থাক। একটু বসে যাই।"
কলু আবার সেই মচমচে চেয়ারটাতে বসতো।
মাস্টারমশাই তাঁর ছোটবেলাকার অনেক গল্প বলতেন। তখন বাবাও নাকি ছোট ছিলেন, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন, পুজোর সময় কাদের বাড়ি যাত্রা গান হতো, পালিয়ে গিয়ে শুনতেন। কলুর চোখ জড়িয়ে আসতো. হাই তুলতে সাহস হতো না; ভাবতো এতক্ষণে সেই দড়িবাঁধাটা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। হাইগুলো মাথায় গিয়ে জমাট বাঁধতো, চম্‌কে জেগে যেতো, শুনতো মাস্টারমশাই বলছেন, "দে বাবা, ছাতাই দে। এ আর আজ থামবে না।"
কলু ছুটে ছাতা এনে দিতো, মাস্টারমশাই চলে যেতেন আর কলুর ঘুমও ছুটে যেতো।
এমনি করে দিন যায়। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে. মাস্টারমশাই বিধুশেখরের কথা বলছেন। সে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে কক্ষনও বায়োস্কোপ দেখেনি, থিয়েটারে যায়নি, বিড়ি টানেনি, গল্পের বই খোলেনি। বলতে বলতে মাস্টারমশাই বললেন, "ওরে, চুপিচুপি দুটো পান সেজে নিয়ে আয় তো দেখি।"
কলু দৌড়ে গেলো, পান দিলো, চুন দিলো, দুটো করে এলাচ-দানা দিলো, বড় বড় সুপুরির কুচি দিলো. আর সব শেষে কি মনে করে বদ্যিনাথের সেই আশ্চর্য বড়িও একটা করে গুঁজে দিলো।
মাস্টারমশাই একটা পান তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন. একটা বইয়ের মতন দেখতে টিনের কৌটোতে ভরলেন। কলু তাক করে রইলো। প্রথমটা কিছু মনে হলো না—তারপর ভালো করে দেখলো. মনে



হল মাস্টারমশাইয়ের কপালের দিকটা কি বকম যেন লম্বাটে দেখাচ্ছে, থুতনিটা যেন ঢুকে পড়েছে. চোখ দুটোও কি রকম পিট-পিট করতে লাগলো।

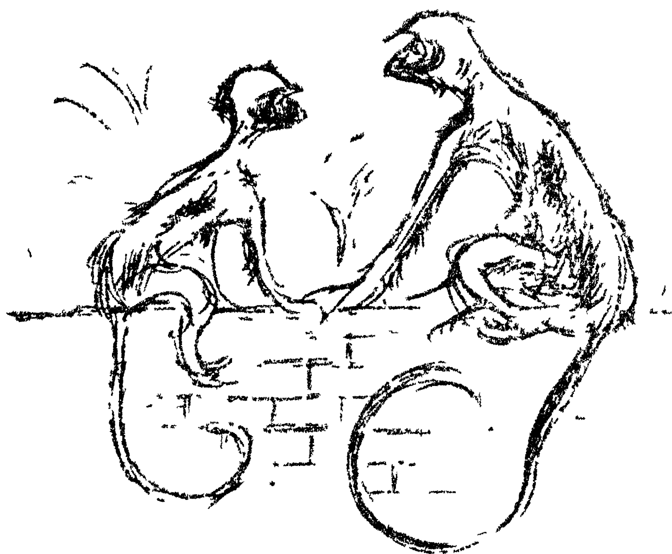
কলুর বুকের ভিতর কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগলো। মাস্টারমশাই বাড়ি যান না কেন ? যদি হঠাৎ ল্যাজ দুলিয়ে হুপ করেন ? এমন সময়ে বৃষ্টি থেমে গেলো, মাস্টারমশাই ধুতির খুঁটটা কাদা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে গেলেন। কলু ভাবতে লাগলো, কদিন আর



ধুতির খুঁট ? অন্য পানটা বিধুশেখর বোধ হয় আজ রাত্রে চেয়ে নেবে, তারপর সেই বা ধুতি নিয়ে করবে কি !

পরদিন বিকেলে বই নিয়ে কলু অনেকক্ষণ বসে রইলো, কিন্তু মাস্টারমশাই এলেন না। সন্ধ্যাবেলা বাবা বললেন, "ওরে তোর মাস্টারমশাই যে হেডমাস্টার হয়ে বিষ্টুপুর চলে গেলেন।"
কলু ভাবলো, বিষ্টুপুর কেন, কিষ্কিন্ধে হলেও বুঝতাম !

তারপর বহুদিন চলে গেছে। কলুর নতুন মাস্টার এসেছেন, তাঁর ছেলের নাম বিধুশেখর নয়, তাঁর ছেলেই নেই। তিনি কলুকে রোজ ফুটবলের, ক্রিকেটের গল্প বলেন—কিন্তু কলুর থেকে থেকে মনে হয়, অন্ধকারে ও বাড়ির পাঁচিলে দুটো কি ল্যাজঝোলা বসে আছে! একটার মুখ কেমন চেনাচেনা, অন্যটা বোধ হয় বিধুশেখর!





ভাই সন্দেশ, অনেক দিন পর তোমায় চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কী যে সব ঘটে গেলো যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম ভাই খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয়ে যেতো, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতো, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেতো!

আজকাল আমি মামাবাড়ি থাকি। আমার মনে হয় ও'রা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মন্‌দা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর শেষের দিকে গুটিকতক টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়েব ছাগলের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু বাবা সুবিধের কথা নয। ছেলেগুলো যায় কোথা? মাস্টারমশায়ের চেহারাটাও ভাই কী



রকম যেন ! সরু-ঠ্যাং পেণ্টেলুন উনি কক্ষনো ধোপার বাড়ি দেন না। শাদা কালো চৌকো কাটা কোট পরছেন তো পরছেনই ! আবার চুলগুলো সামনের দিকে খুদেখুদে, পিছনের দিকে লম্বা মতন, মধ্যি খানে দাঁড় করানো ! মাঝের গোঁফ বেঁটেখাঁটো, পাশের গোঁফ ঝুলোঝুলো ! ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কিসের চামড়া, কিসের তেলে চুবিয়ে, কিসেব লোম দিয়ে সেলাই করা ! ও বাবাগো, মাগো ! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে ! মানুকে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘবের ভিতর সাতটা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে, আর



ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই গা নাচাচ্ছেন! পরের সপ্তাহে মানুকে আবার দেখেছে ঘরের ভিতর ছ'টা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে লাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের কচ্ছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে পেন্সিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই সেফটিপিন দিয়ে কান চুলকোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে ন'টা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন!

তা ছাড়া সেই যে বিভু আরশুল্লা পুষতো, একবার গুবরে পোকাও খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে—মাস্টারমশাইয়ের বাস্কে হলদেটে তুলট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে! ওঁর লেবু গাছে মাকড়সাবা কেন জানি জাল বোনে না; পেঁপে গাছে সেই গোল-চোখ চকচকে জন্তু নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে মাস্টারমশাইয়ের রোগা গিন্নি মোটা বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে দিনরাত ওৎ পেতে থাকেন। কিন্তু কিছু বলা যায় না! মন্দা তো ও-বাড়ি কোনোমতেই যায় না, মেজোও বাড়ির ছায়াটি মাড়ায় না, আর ছোট ছেলে ধনা, তার তো ও-বাড়ির হাওয়া গায়ে লাগলেই সর্দি-কাশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ও-বাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা সজনে ডাঁটা নেয় না!



মা কিন্তু ওদের কুমড়ো ডাঁটা দিব্যি খান; আর বড়মামা তো ওঁরই দাদা, ঐ একই ধাত। ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কি ম্যাজিক, কি মন্তর-পড়া এ সব একেবারে বিশ্বাস করেন না! কে জানে কোন দিন হয়তো কানে ধরে ঐ ইস্কুলেই আমাকে ভর্তি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারা জীবন ব্যা-ব্যা করে নটে চিবুবো? ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড়মামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন পাথরের উপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি!—কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ!—কান্না পেয়ে গেলো ভাই।

এদ্দিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে। বড়মামা যখন তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচর ফ্যাচর হাসেন। বুঝছি গতিক ভালো নয়। দু'একবার তিন তলার ছাদে গিয়ে ব্যা-ব্যা করে ডেকে দেখেছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না গোটাকতক দুব্বো ঘাস চিবিয়ে দেখেছি—বদ খেতে,



তাতে আবার ছোট্ট শুঁয়ো পোকা ছিলো! খোকনকে বলেছি গলায় দড়ি বেঁধে একটু টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজী হলো না। এদিকে অভ্যেস না থাকলে কী যে হবে তাও তো জানি না!

এই সব নানা কারণে এতো কাল চিঠি লিখতে পারিনি বুঝতেই তো পারছো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর সইলো না। 'কেডস' পায়ে দিয়ে সুটসুট মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বেড়া টপকে, ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে, জানলার গরাদ খিমচে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়িমাছের মতন ডান্ডার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারলাম।

দেখলাম মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে

হুঁকো খেতে চেষ্টা করছেন, আর গিন্নি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন—কোনটা আস্ত উঠছে, গিন্নি হাসছেন; কোনটা আধ-খ্যাঁচড়া উঠছে, গিন্নি দাঁত কিড়মিড় করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বলে সমস্ত ক্ষণ বকবক করছেন ভাই, বড় ভালো লাগলো।

কিন্তু আনন্দের চোটে যেই খচমচ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চম্‌কে বললেন, "ওটা কি রে?" ভাবলুম এবার তো গেছি! কান ধরে ঝুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নোখ দিয়ে খিমচে দিয়ে গিরগিটির মতন মুখ করে বললেন—"ও বাঁদর!" বললুম, 'আজ্ঞে সার্‌, ছাগল বানাবেন না সার্‌!" বললেন, "বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?" গিন্নিও ফিসফিস করে যেন বললেন, "ওটিকে রাখো, আমি পুষবো।"

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিন্নি মাথায় হাত বুলিয়ে শিং আছে কিনা দেখে বললেন, "তোমার মতন আমার একটি খোকা ছিলো।" জিগগেস করলুম, "তার কি হলো?" বললেন, "তার এখন দাড়ি গজিয়েছে।" বলে বড় বড বাতাসা খেতে দিলেন। তার পর বাড়ি চলে গেলাম। জিগগেস করতে সাহস হলো না, দাড়ির সঙ্গে সঙ্গে খুরও গজিয়েছিলো কিনা।

ইস্কুলের কথা এখনও কিছু ঠিক হয়নি, এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিও না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে টোঁয়াড়ে খোঁজ কোরো। ইতি—

তোমাদের গণ্‌শা





রাত যখন ভোর হয়ে আসে তখন ঐ তিন-বাঁকা নিমগাছটায় হুতুম প্যাঁচাটারও ঘুম পায়। নেড়ু দেখেছে ওর কান লোমে ঢাকা, ওর চোখে চশমা, ওর মুখ হাঁড়ি।



হুতুমটা কেন যে চিল-ছাদের ছোট খুপরিতে পায়রাদের সঙ্গে বাসা করে না, নেড়ু ভেবেই পায় না। বোধ হয় ভূতদের জন্যে। নিমগাছ-তলায় ভূত আছে। একদিন ভোর বেলায়, মই বগলে ছাগলদাড়ি লোকটা রাস্তার আলো নিবিয়ে নিবিয়ে চলে

গেলে পর, নেড়ু দেখেছিলো কোমরে রুপোর ঘুনসি-ওয়ালা, মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল, ভূতদের ছোট কালো ছেলে নিম-গাছ তলায় কাঁসার বাটিতে নিমফুল কুড়চ্ছে। নেড়ুকে দেখেই ছেলেটা এক চোখ বুজে বগ দেখালো। নেড়ু ভাবলো ভূত কিনা তাই ভদ্রলোক নয়।

তারপর অনেক দিন নেড়ু অনেক বেলা পর্যন্ত গাঁক গাঁক করে ঘুম লাগিয়েছে, শেষটা এমন কি ভজাদা এসে ঠ্যাং ধরে টেনে খাট থেকে নামিয়েছে। নেড়ু কিন্তু একটুও রেগেমেগে যায়নি। ও তো আর সুকুমার-দা নয় যে মুখ দেখলে বালতির দুধ দই হয়ে যাবে! কিন্তু সেই ছানাটাকে আর দেখা হয়নি।

শেষটা হঠাৎ একদিন নেড়ু স্বপ্ন দেখলো কালো ছেলেটা ওকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে নাকের ফুটোয় কাগের নোংরা পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। রাগের চোটে নেড়ুর ঘুম ছুটে গেলো। ইচ্ছে করলো ছেলেটার মাথায় সুপুরি বসিয়ে লাগায় খড়ম! খানিক চোখ রগড়ে, জিভ দিয়ে তালুতে চুকচুক করে চুলকে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো মই বগলে সেই লোকটা। তারপর নিমতলায় তাকিয়ে দেখলো, ভূতের ছানাটা একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বেজায় হাসছে, যেন কালো ভাল্লুক মুলো চিবোচ্ছে। সে কি বিশ্রী হাসি! গোটাকতক শুট লাগালে হয়!

ছেলেটা নেড়ুকে দেখে আজ আর বগ দেখালো না, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। ভূতের ছেলে বাবা! বিশ্বাস নেই! নেড়ুর একটু

ভয় করছিলো, ঘরের ভিতর এদিক-ওদিক একবার তাকালো। দেখে কিনা কুঁজোর পিছন থেকে একটা এয়া বড়া টিকটিকি মুণ্ডু বাড়িয়ে, ঘোলাটে চোখ পিটপিট করে ঘুরিয়ে আহ্লাদে আহ্লাদে ভাব করে টিক-টিক-টিক করে আবার মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে নিলো, কেমন যেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব! নেড়ুর ভারি রাগ হল। কী, ভয় পাই নাকি! নেড়ু আস্তে আস্তে নিচে গেল। দাঁত মাজলো না। চোখ ধুলো না। তাতে কি হয়েছে? সেই ছেলেটার তো নাকে সর্দি! নিমতলায় যাবার পথে দেখে দুই দিকে দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। কতকগুলো গোলগোল মতন, সেগুলো ধোপার মা দিয়েছে; আর কতকগুলো ঠ্যাং-ওয়ালা, সেগুলো ধোপার মায়ের মেয়ে দিযেছে। কিন্তু নিমতলায় গিয়ে দেখে ছেলেটা কোথায় যেন সট্‌কে পড়েছে। কি জানি ভোর হয়ে এসেছে, আলোটালো দেখে উঠে গেল না তো!

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় নেড়ুর দাঁত ব্যাথা করছিলো, তাই লবঙ্গ-জল দিয়ে মুখ ধুয়ে জানলার উপর বসে ভাবছিলো, আচ্ছা নেপাল খুড়োর কেনই বা অমন সিন্ধুঘোটকের মতন গোঁফ, আর বিধুদাই বা কেন দিনরাত টিকটিক করেন!

এদিকে ওদের বাড়ির দরোয়ান কী যেন গাইছিলো, মনে হচ্ছিল—

"নিমতলাতে আর যাব না,
কে-লো-ভূতে-র-কা-লো-ছা-না!"

হঠাৎ শুনলো, "এইয়ো!" চমকে আর একটু হলে ধুপুস করে পড়েই যাচ্ছিলো! আবার শুনলো "এইয়ো!"

চেয়ে দেখে নিমতলার আবছায়াতে সেই ভূতের ছানাটা! নেড়ু গলা নামিয়ে হিন্দিতে ফিসফিস করে বললে, "হাম শুনতে পাতা।"

ছানাটা আবার বাংলায় বললে—"সকালে কি পায় শেকড় গজিয়েছিলো?"

নেড়ু বললে, "আমি তো গেলুম, তুমিই আলো দেখে চলে গেছিলে।"

ছেলেটা বললে, "দুৎ, আলো নয়, বাবাকে দেখে।"

নেড়ু ভাবলো—কেন, বাবাকে দেখে চলে যাবে কেন? নেড়ু শুধু একবার বাবাকে দেখে চলে গিয়েছিলো—সেই যেবার দরোয়ানের হুঁকা টেনেছিলো। তাই জিগগেস করলো—"হুঁকো টেনেছিলে?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বললে, "দুৎ। তার থেকে বিড়ি ভালো।"

"তোমার বাবা কি গাছে থাকেন?"

"দুৎ! থাকেন না, চড়েন। আমি অনেক তাগ করে থাকি, কিন্তু কক্ষনো পড়েন না!"

"তিনি কি প্যাঁচা?"

"দ্যুৎ—!" তারপর ছেলেটা একটা কথা বললে যেটা মা একদম বলতে বারণ করেছেন। নেড়ু বললে, "ছি!—আচ্ছা, তাঁর পা কি উলটোবাগে লাগানো?"

এবার ছেলেটা বেদম রেগে গেল। ভুরু কুঁচকে, ফোঁসফোঁস করতে

লাগলো, আর হাতটাকে ঘুঁষি পাকাতে আর খুলতে লাগলো, যেন এই পেলেই সাবড়ে দেয়! তারপর কী ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে বললে—

"ঐ যে মিস্ত্রিগুলো সারাদিন বাঁশের টংএ চড়ে তোমাদের বাড়ির বিশ্রী জানলাগুলোতে তোমার গায়ের রংএর মতন বদ সবুজ রং লাগায়, ওদের একটা দড়িবাঁধা রংএর টিন, আর একটা বড় চ্যাপটা রং লাগাবার জিনিস যদি আমাকে এক্ষুনি না এনে দাও তা হলে তোমাকে, তোমার বাবাকে, তোমার দাদাকে, আর তোমার মাকে কচু-কাটা করবো। তোমাদের ছোট খুকিকে পানের মশলা বানিয়ে কড়কাড়িয়ে চিবিয়ে খাবো। তোমাদের মাসি-পিসি যে যেখানে আছে তাদের থেঁতলো করবো! তোমাদের রুটিওয়ালা, ঘিওয়ালা, আর যারা তোমরা রাখো সব কটাকে লম্বা লম্বা ফালি করে ছিঁড়ে কাপড় শুকুবার দড়িতে ঝুলিয়ে সুঁটকি মাছ বানাবো। আর তোমার যত বন্ধু আছে সবগুলোকে নুনজল দিয়ে কাঁচা কাঁচা গিলে খাবো।"

বাপরে, কি হিংস্র খোকা!

নেড়ু তাড়াতাড়ি একটা টিন, আর দু-তিনটে বুরুশ তাকে দিয়ে এলো। ছেলেটা ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

রাতে নেড়ু শুনতে পেলো ফিসফিস করে কারা কথা বলছে। কানে আঙুল দিয়ে শুলো তবু মনে হল কে যেন বলছে—

"আছে—আছে নিম গাছে!"

নেড়ু ভাবলে, ওরে বাবা, কী আছে রে?—পান্তভূত? কবন্ধ? পিশাচ? স্কন্ধকাটা? গন্ধবেনে? শাঁখচুন্নি? পেতনি? প্যান্তা-খেঁচী?

নেড়ু তো নাক-মুখ ঢেকে রাম ঘুম লাগালো।

পরদিন সকালে নিচে যাবার সময় সিঁড়ির জানলা দিয়ে দেখে. রাস্তায় ও-বাড়ির বড় কর্তা এ-বাড়ির দরোয়ান, দাদা, বাবা, মণ্টুর বাবা, দিন্‌দা, আরও কত কে। সবাই ঠ্যাং হাত ছুঁড়ে বেজায় চ্যাঁচাচ্ছে!

নেড়ু আরও দেখলো রাস্তার সব বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে সবুজ রং দিয়ে নানান রকম চিত্তির করা, পাশের বাড়ির শাদা গেটটা ডোরা কাটা!

হঠাৎ নেড়ুর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার যোগাড় করলো—সেই হিংস্র ছানাটা পথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, তাব এক হাতে রংএর বুরুশ, আর এক হাতে রংএর টিন, এক কান ও-বাড়ির দরোয়ান ধরেছে. আর এক কান এ-বাড়ির লছমনসিং। আর ছেলেটা জোরসে চেল্লাচ্ছে।

তারপর ভঁক্‌ ভঁক্‌ করে একটা মোটর ডাকলো, আর পথ ছেড়ে সকলে চলে এলেন। লছমনসিংও কানে শেষ একটা প্যাঁচ দিয়ে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিলো। তারপর ওদের বাড়ির দরোয়ান

ওর হাত থেকে খামচা মেরে রংএর টিন আর ব্রুশ নিয়ে গেলো, হিন্দিতে আর বাংলাতে বিড়বিড় কী সব বকতে বকতে, শুট মারতে মারতে ওদের বাড়ি দিয়ে গেলো!

নেড়ু পাড়াশুদ্ধু সক্কলের সাহস দেখে এমন হাঁ হয়ে গেলো যে দেখতেই ভুলে গেল ছেলেটার পা উলটোবাগে লাগানো কিনা!





নন্দর আজ বেজায় মন খারাপ। সেই সকাল থেকে সব জিনিসকে কিসে যেন পেয়েছে! ঘুম থেকে উঠেই ভোঁদাকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে অত ভালো হকি স্টিক্‌টার হ্যাণ্ডেলের সুতো কতখানি এলো খুলে! তায় আবার ভোঁদা হতভাগা এমনি চেঁচালো যে বড়মামা এসে নন্দর কান-পেঁচিয়ে মাথায় খটাং খটাং করে দুই গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন।

তারপর, সেই দেয়ালে কাজলকালি দিয়ে কুকুর তাড়া করছে, মোটা লোকটার ছবি আঁকবার জন্যে বাবা মন্টুর সঙ্গে সেই চমৎকার জায়গায় সেই মজার জিনিস দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। নন্দ আর কী বলে! ছি, মণ্টুই বা কি ভাবলো বলো তো? নাঃ! বুড়োরা যে কেন পৃথিবীতে জন্মায় বোঝা যায় না!



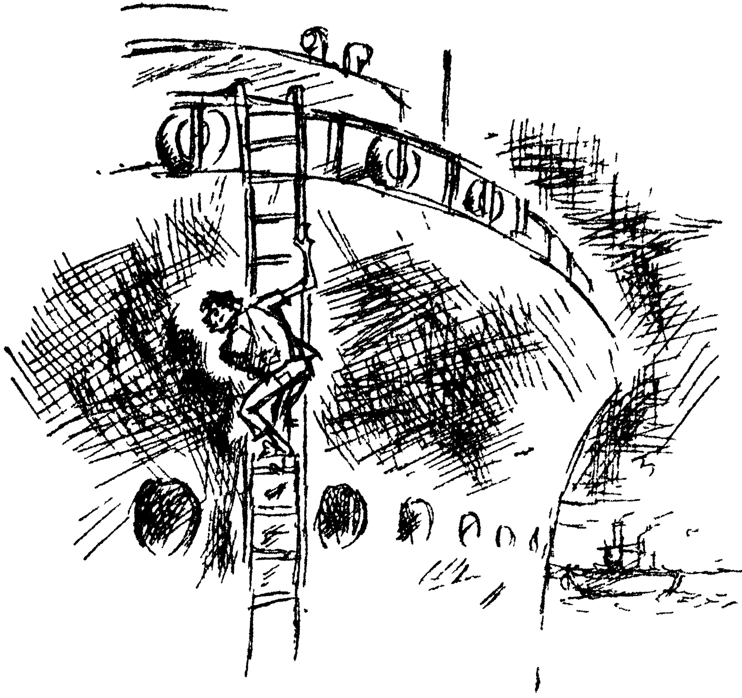
আচ্ছা, অন্যদের বাড়ির লোকরাও কি এমন হাঁদা ? এরা কি—চ্ছু বোঝে না। এই তো কালই দিদির নাগরাইয়ের শুঁড় পাকিয়ে দেবার জন্য দিদি চাঁটালো। আচ্ছা, শুঁড় পাকিয়ে কি এমন খারাপটা

দেখাচ্ছিলো? ভারি তো নাগরাই! এর চেয়ে আর কোথাও চলে যাওয়া ভালো—ইজিপ্টে যেখানে নীল নদীর ধারে ফ্লেমিঙ্গো পাখিরা মাছ ধরে খায়, আর মস্ত মস্ত কুমিররা বালির উপর রোদ পোহায়। নয় তো মানস সরোবরে যেখানে একশো বছরে একটা নীল পদ্মফুল ফোটে। সেজদা বলেছে, কাগজে আছে কারা নাকি ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে বোঁচকা বেঁধে, টিনের দুধ, বিস্কুট, কম্বল-টম্বল নিয়ে সেখানে যাচ্ছে।

কিম্বা তাদের ছেড়ে নন্দ আরও উপরে যাবে, যেখানে লোমওয়ালা মানুষরা কিসের জানি রস খায়, সে খেলেই গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কিম্বা—যাবার তো কত জায়গাই আছে!

খিদিরপুরের ডকেই যদি কাজ নেয় কে খুঁজে পাবে! সেই যে এক-বার নন্দ দেখেছিলো, একটা পুলের তলায় ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির হাঁড়িতে কী রেঁধে খাচ্ছিলো কারা সব, ডকের কুলি হবেও বা। সেই রকম করে থাকবে। কিম্বা যারা গান করে করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গেও তো জুটে যাওয়া যায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে মেলাতে মেলাতে বেড়ানো যাবে। কিন্তু তার আবার একটা অসুবিধে আছে। দিদিকে গান শেখাতে এসে গোপেশ্বরবাবু বলে গেছেন, কোকিলের ডিম ভেঙে খেলেও এ ছেলের কিছু হবে না।

গান করতে না পারুক, গোরুর গাড়ি তো চালাতে পারবে! হঠাৎ একটা ভীষণ সঙ্কল্প করে নন্দ সটান উঠে একেবারে ঘোরানো সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।



মা বলেছেন, “খববদাব ও দরজা খুলবি নি। বিপদে পড়বি।” কি বিপদ অনেক ভেবে নন্দ মাসিমাকে জিগগেস করেছিলো। মাসিমা বলেছিলেন, “ওরে বাবা! সে ভীষণ বিপদ!”

“কি ভীষণ ?” জিগগেস করাতে আবাব বললেন, “সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে বেজায় হিংস্র লোকেরা নাকি বাঁকা ছুরি হাতে চকচকে চোখ

করে ওঁৎ পেতে আছে সারা রাত, ভোরবেলা গঙ্গায় জাহাজের বাঁশিগুলো যেই বেজে ওঠে ওরাও কোথায় আবছায়াতে চলে যায়।"

নন্দ জানতে চাইলো তারা কোত্থেকে এসেছে। মাসিমা বললেন, "কেউ এসেছে জাভা থেকে, কেউ সানফ্রানসিস্কো, কেউ কাম্বোডিয়া থেকে। আউটরাম ঘাটের কাছে তাদের জাহাজ নোঙর দেওয়া আছে, জাহাজের পাশের রেলিং-না দেওয়া সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রাত দুপুরে নেমে এসেছে, ভোর না হতেই আবার ফিরে গিয়ে জাহাজের নিচে অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড উনুনে কয়লা পুরবে।"

একবার অনেক রাতে নন্দ কোথা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ঘরে ফিরছিলো। তখন নিজের চোখে দেখেছিলো ছোট ছোট টিমটিমে আলো নিয়ে কারা যেন ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। তাই দরজার সামনে এসে নন্দ একবার থামলো। বেশ রাত হয়েছে, বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে, কেমন অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে। হাওয়া তো রোজই দেয় আজকাল, কিন্তু এ রকম তো কখনও মনে হয় না।

নন্দ দরজা খুললো, চামচিকের খোকার কান্নার মতন একটা শব্দ হলো। একটা বড় সাইজের ঠ্যাঙে লোমওয়ালা মাকড়সা সড়সড় করে নন্দর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেলো।

প্রথম সিঁড়িতে পা দেবার আগে নন্দ উপর দিকে তাকালো। যতদূর দেখা যায় সিঁড়ি ঘুরে পাঁচতলার ছাদ পর্যন্ত উঠেছে, আর নিচের দিকে যতদূর দেখা যায় ঘুরে ঘুরে একতলার শানবাঁধানো গলি পর্যন্ত নেমেছে।

সিঁড়ির রেলিংটা ক্যাঁ-কোঁ করে নড়ে উঠলো, কার জুতো জানি চাপাগলায় মচমচ করে উপর থেকে নেমে আসতে লাগলো। নন্দর হাত পা হিম হয়ে গেল, অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে চ্যাপটা হয়ে টিক্‌টিকির মতন লেগে রইলো।

তার পর দেখল বুড়ো-আঙুল-বার-করা, জিভ-কাটা ছেঁড়া হলদে বুট পায়ে, তালি দেওয়া সুতো-ঝোলা লম্বা পেন্টেলুন পরা দুটো ঠ্যাঙ সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নামতে লাগলো। তার পর দেখলো, পিঠে তার মস্ত ঝুলি, থুতনিতে খোঁচা দাড়ি, নাকের উপর আঁচিল, তার উপর তিনটে লোম, ন্যাড়া মাথায় নোংরা টুপি—বোধ হয় সেই হিংস্র লোকদের কেউ একজন! ভয়ের চোটে নন্দর এক-পাটি চটি ছিটকে খুলে, ঠংঠং করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে চললো, আর সেই হলদে বুট পরা হিংস্র লোকটা থতমত খেয়ে বোঁচকা ফেলে দে ছুট!

নন্দর কিন্তু আর কিচ্ছু মনে নেই। কেমন ভেড়ু বানিয়ে গিয়েছিলো! লোকটা কিন্তু নিজেই টেনে কোথায় দৌড় লাগালো!

এদিকে পাঁচতলার লোকেরা আজও গল্প করে নন্দ নামে একটি ছোট ছেলে চোর ভাগিয়ে জিনিস বাঁচিয়েছিলো।

শুনে শুনে নন্দ মনে ভাবে—বুড়োরা কি হাঁদা! কিন্তু বাইরে কিচ্ছু বলে না, চালাক কিনা!



অমৃতবাজার পত্রিকার টুকরোটা হাতে নিয়ে বাবার প্রকাণ্ড চটি-জোড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোতন খুব লক্ষ্য করে দেখলো, পিসিমা এসে নিবিষ্ট মনে খোকনাকে ঠ্যাঙাচ্ছেন।

প্রথমে ডান কান প্যাঁচালেন, তারপর বললেন, "হতভাগা ছেলে!" তারপর বাঁ গালপট্টিতে চাঁটালেন, তারপর বললেন, "তোকে আজ আমি—" তারপর বাঁ কান প্যাঁচালেন—"আদা লঙ্কা দিয়ে ছেঁচবো!" তারপর ডান গালপট্টিতে চাঁটালেন—"তেল নুন দিয়ে আমসি বানাবো।" তারপর পিঠে গুমগুম করে গোটা দশেক কিল কষিয়ে, মাথা থেকে চিমটি চিমটি চুল ছিঁড়ে, জুলপি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ঠিক ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে! টিপ দেখে ঘোতন তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারলো না।



আরেকটু হলে নিজেই ধরা পড়ে যাচ্ছিলো। তবেই হয়েছিলো! ভীষণ না রাগলে পিসিমার নাক কখনও ও-রকম ফোলে না। অমৃতবাজারের কুচিটুচি ফেলে ঘোতন তো হাওয়া! খোকনাটারও যা বুদ্ধি! এত করে বলে দেওয়া হলো যেখানে হেয়ারপিন সেই পর্যন্ত পিসিমা পড়েছেন, আচারেব জন্য তার এদিক থেকে কাগজ

ছিঁড়িস! বোকা ভাবলে কি না 'এদিক' মানে পিছন দিক, মনেও গজালো না যে একটু পড়লেই ছেঁড়া পাতা এসে যাবে। মাথায় কি-চ্ছু নেই, এক যদি গোবর থাকে! বেশ হলো! আচারও পেলো না, ঠ্যাঙাও খেলো।

আবার পিসিমার টিপের কথা মনে হলো। কি চমৎকার টিপ! সেই যে সেবার ক্রিকেট সিজন-এ পানু নিজের ব্যাট দিয়ে খুঁচিয়ে স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে, জিভ কেটে, মাথা চুলকে, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে বাউণ্ডারির দড়িতে ঠ্যাঙ আটকে খুঁটি শুদ্ধ দড়ি উপড়ে এনেছিলো। বড়কাকা ছিলেন ক্যাপ্টেন, তিনি একহাতে পানুর শার্টের কলার আর একহাতে পেণ্টেলুন ধরে তাঁবু থেকে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়া টপকে ওপারে ফেলে দিয়েছিলেন, আর পিছন পিছন ওর জুতো, প্যাড, গ্লাভস, ব্যাট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, প্রত্যেকটা ওর গায়ে লেগেছিলো! বাজে প্লেয়ার হলে কি হবে কি রকম টিপ! পিসিমারই বা হবে না কেন, ওঁরই তো দিদি!

ঘোতন এদিক ওদিক ঘুরে আচারের কথা ভুলতে চেষ্টা করলো। নাঃ! খোকনাটা আবার কোথায় উধাও মারলো, তার যে পাত্তাই নেই!

অনেক খুঁজে দেখা গেল, ঐ রেগেমেগে ভালো ভালো ব্যবহার-না-করা ডাক-টিকিটগুলো টেবিলের ঠ্যাঙে একটার নিচে একটা লাইন করে দিব্যি থুতু দিয়ে সাঁটছে! ছোঁড়ার সাহস আছে!

ঘোতনা কাছে এসে আস্তে আস্তে জিগগেস করলো—"লেগে-ছিলো?"

খোকনা বললে, "কী লেগেছিলো ?"

"কী মুশকিল ! লাগবে আবার কিসে ? আরে ঠ্যাঙানিতে, ঠ্যাঙা-নিতে !"

"উঁহু !"

"তবে যে দেখলুম মাথাটা এমনি হয়ে গেল ?"

"ও রকম মাঝে মাঝে হয়।"

"খাবি নাকি আচার ?"

"না।"

"ঘেবড়ে গেছিস ?"

"দুৎ ! সত্যি বলছি, না।—আচ্ছা তুই আন তো দেখি।"

ঘোতন এক ছুটে ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে চলে গেল। দরজার বাইরে সারি সারি বড়ির থালা অন্ধকারে এ ওকে ঠেলাঠেলি করে চোখ টিপছে। সারা সকাল মা চিনু মিনুকে নিয়ে বড়ি দিয়েছেন। ঘোতন দেখেছিলো মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি ! প্রথমটা বড়ি চ্যাপটা চ্যাপটা ঘুঁটের মতন হচ্ছিলো। যেই মা বললেন যার বড়ি যত উঁচু তার বরের নাক তত উঁচু, অমনি বোকাগুলো টেনে টেনে বড়ির নাক তুলতে লাগলো। বুঝবে শেষটা !

যাক, কিন্তু দরজায় যে তালামারা ! এ্যাঃ, মিলার লক ! হেয়ার-পিন পাকিয়ে ঘোতন তাকে এক মিনিটে সায়েস্তা করে দিলো। আজ আর কোনো ভয় নেই। কী করবে পিসি ? ঠ্যাঙাবে ? ওঃ ! ঠ্যাঙ নেই ?

তাকে তাকে আচার ! বড় বয়ামে, ছোট বয়ামে, মাটির ভাঁড়ে,



পাথরের থালায়, শিশিতে, বোতলে। ঘোতনের চোখ দুটো চার-
দিকে পাইচারি করতে লাগলো। ঠিক সেবারের বাঙলী পল্টনের
মতন—একটা এগোনো, একটা পেছনো, একটা লম্বা, একটা বেঁটে !
বাঁকা লাইন, দুধের দাঁত পড়ে খোকনার যেমন ত্যাড়াব্যাঁকা দাঁত
উঠেছিলো সেই রকম। সত্যি সেপায়ের মতন। আনাড়ি সেপাইকে
যেমন কাঁচা কাঁচা ধরে এনে এক পায়ে ঘাস বেঁধে মার্চ করায়—
'ঘাস বিচালি' 'ঘাস বিচালি' ! লেফট রাইট লেফট রাইট তো আর
বোঝে না !

আজ কে পিসিমাকে কেয়ার করে !

বয়ামের গায়ে টোকা মেরে মেরে ইচ্ছে করে ভিতরের আচারের
ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

কী রকম একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছিলো। ঘরের আনাচে কানাচে ছুঁচোদের বাবা, মা, দাদা, দিদিরা চুপ মেরে কিসের যেন অপেক্ষা করছে! দেয়ালের গায়ে সুপুরির মতন কেঁদো কেঁদো মাকড়সা খাপ পেতে রয়েছে। ছাদের উপর টিকটিকিরা খচমচ করে চলাফেরা করছে। তারা অনেক দিন পায়ের নখ কাটেনি। বড় বয়ামের পাশে ওটা কি? নিশ্চয় আমতেল, কেটে পড়ার চেষ্টায় আছে। তুলে দেখে—এ মা! আম তো নয়, আরশুলা চ্যাপটা! যেই পেণ্টেলুনে হাতটা মুছতে যাবে—এই রে, পিসিমা! ঘোতনের আত্মারাম শুকিয়ে জুতোর সুকতলার মতন হয়ে গেলো, হাত পাগুলো পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেলো।

পিসিমা বললেন, "দরজার কাছে হাওয়া আটকে দাঁড়ালে আচার ভেপসে উঠবে।" ঘোতন ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, পিসিমা আবার ডেকে বললেন, "আচার নিয়ে যাও।"

পিসিমা যে কী! বকলেও বিপদে ফেলেন, না বকলেও বিপদে ফেলেন। ঠেঙিয়েও হার মানান, আবার না ঠেঙিয়েও হার মানান। অন্য বুড়োদের মতন একটুও না।

ঘোতনের ভারি লজ্জা করলো।



আয়না দেখে আঁতকে উঠলুম। এ তো আমার সেই চিরকেলে চেহারা নয়! সেই যাকে ছোটবেলা দেখেছিলুম ন্যাড়া মাথা নাকে সর্দি, চোখ ফুলো! তারপর দেখেছিলুম চুল খোঁচা, নাক খাঁদা, গালেটালে কাজল! এই সেদিনও দেখলুম খাকি পেণ্টেলুন, ময়লা শার্ট, মুখে কালি! এমন কি আজ সকালেও দেখেছি কালো কোট, ঝাঁকড়া চুল, রাগীরাগী ভাব!

এই সেই চিরকেলে আমি নয়। দেখলুম বয়েসে ঢের, মুখ ভরা নোংরা ঘেমো কাঁচাপাকা দাড়ি, ঝুলোঝুলো গোঁফ, চোখে নীল চশমা, গলায় হলদে লাল ডোরা কাটা কম্ফর্টার, গায়ে গলাবন্ধ লম্বা কালো কোট, বুকের কাছে বোতাম নেই, মরচে-ধরা সেফটি-পিন আটা।—অবাক হয়ে গেলুম!



আয়নার পিছনে হাতড়ে দেখলুম কেউ যদি লুকিয়ে বসে থাকে। দেখলুম কেউ নেই, খালি কাঠের উপর আঙুলগুলো খচমচ করে

উঠলো, নখের মধ্যে খানিকটা বার্নিশ না ময়লা কি যেন ঢুকে গেলো।

বিরক্ত লাগলো।

গলা ‘হুহুম’ করে সাফ করে বললুম, “কে ?”

সেই লোকটা দাড়ি চুলকে মুচকি হেসে বললো, “ন্যাকা! চেন না যেন!” বলে এক হাতে গোঁফ আঁচড়ে উপরে তুলে দিলো, অন্য হাতে দাড়ি খামচে নিচে ঝুলিয়ে দিলো। দেখলুম নিচে আমারই নাকমুখ ঢাকাচাপা রয়েছে!

বললুম, “য়্যাঁ!”

লোকটা সিঁড়ি না কি যেন বেয়ে তরতর করে খানিকটা উপরে উঠে গেলো, চাপা গলায় বললো, “বাকিটাও পছন্দ হলো কি ?” দেখলুম তার মুণ্ডু দেখা যাচ্ছে না। তার জায়গায় নোংরা ধুতি হাঁটু অবধি, গোড়ালি ছেঁড়া লাল মোজা গুটিয়ে নেমেছে, পাম্প-শু’র ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে, নখগুলো আঁকাবাঁকা, মাংসে ঢাকা।

ব্যাপারটা কোনও দিক দিয়ে সুবিধে বুঝলুম না। মুণ্ডু ফিরিয়ে চলে গেলুম। যাবার আগে বাতি নিবিয়ে ছায়াটাকে নিকেশ করে দিলুম। তবু মনে হলো আয়নার ভিতর বুনো অন্ধকার থেকে কে যেন বুড়ো মানুষ হ্যাঃ হ্যাঃ করে বিশ্রী হাসি হেসে আনন্দ করছে। কি আর বলবো! রাগলুম, ভয়ও পেলুম। খেতে গিয়ে মনে হলো সবাই যেন একটু অন্য রকম করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হলো যেন সুবিধে পেলেই সব কটা গোঁফের

ফাঁকে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হেসে নিচ্ছে। যেন সেই বুড়ো লোকটার কথা আর গোপন নেই, সবাই জেনে ফেলে আমোদ করছে! খাবারগুলো বদ লাগলো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। তবু রক্ষে নেই। যেখানে যাই কে যেন নীল চশমা পরে সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভালো করে লক্ষ্য করলুম কানে তার পাকা লোম, শোনবার সময়ে খাড়া হয়ে ওঠে। একবার জোর করে বললুম, "এইয়ো। আমি অন্য লোক। তুই কে রে?" বলতেই সে কোথায় মিশিয়ে গেলো। শার্টের গলার চারপাশে আঙুল চালিয়ে তাগড়া হয়ে নিলুম।

এমন সময় গঙ্গুদা বললো, "এদিকে আয়।"

গেলুম—বাপরে, না গিয়ে উপায় আছে? ও বাপু ভীষণ লোক। মুখে দাড়ি, রোগা শরীর, বাবাজিদের সঙ্গে ভাব। শাদা শিমুলের শেকড় খাইয়ে নাকি পড়া দাঁত গজিয়ে দিতে পারে। দেখলুম সে চোখ পাকিয়ে পায়ের পাতা উলটে, সটাং হয়ে খাটে বসে দুই হাঁটুতে হাত বুলুচ্ছে, মুখে একটা খিদে খিদে ভাব। বললে, "ঘাড়ে সুড়সুড়ি দে।" ভাবলুম বলি, "এখন পারবো না।" কিন্তু সে এমন কটমট করে চেয়ে বললে—

ও পারে যেও না ভাই, ফটিংটিঙের ভয়,
তিন মিনসের মাথা কাটা, পায়ে কথা কয়।
তাদের সঙ্গেতে মোর চেনাশোনা আছে রে,
সুড়সুড়ি না দিস যদি বিপদ ঘটতে পারে রে।

দেড়টি ঘণ্টা সে গুনগুন করে গাইতে লাগলো—

কেরোসিন ! কেরোসিন !
কেরোসিনের সুবাতাসে
মহাপ্রাণী খইসে আসে,
খাও, খাও, ভইরে টিন,
কেরোসিন ! কেরোসিন !

রেগে ভাবলুম দিই ব্যাটার ঘাড়ে চিমটি। সে আরও গাইলে-—

অনুতাপে দগ্ধ হবি,
ড্যাও দুদু চেটে খাবি।

জিগগেস করলুম, "ড্যাও দুদু কি ?"
বললে, "ড্যাও পিঁপড়ের দুধ। দে, সুড়সুড়ি দে, অতো খবরে কাজ কি ?"

খানিক পরে আয়নার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখলুম আবার সেই লোকটা। এবার আবার মাথায় মান্‌কি ক্যাপ। বড় কান্না পেলো। বললুম, "এমনিই তো যথেষ্ট ছিলো, আবার ওটা কেন ?"
সে বললে, "ছ্যাঃ। গঙ্গুদাকে ভয় পাও, আবার কথা ! দুকানে



যে তুলো গুজিনি সে তোমার ভাগ্যি আর আমি দয়ালু বলে। ছ্যাঃ, এত প্রাণের ভয়!"

আবাব বললুম, "একটু আগে তো অমন ছিলো না। ওটা খুলে ফেলুন বড় বদ, বড় বদ।"

সে বললে, "তাম্পর অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক জিনিস অদল বদল হয়ে গেছে। আর চল্লিশটা বছর সবুর করো, এই এমনটিই হবে। ছ্যাঃ! গঙ্গুটাকে মানুষ হতে দেখলুম, তাকে ভয় পায়! আরে তার দাঁত পড়তে ক্যায়সা চেঁচিয়েছিলো আজও মনে আছে।"

চোখ পিট পিট করে বললুম, "আপনি বুড়ো মানুষ, আর কি বেশি বাঁচবেন!"

লোকটা চকাত চকাত করে হেসে বললো, "ফ্যাচর! ফ্যাচর! সেই আনন্দেই থাকো! বুঝলে না হে? আমিই হচ্ছি তুমি। তুমি যেমন ভীতু, কাপুরুষ, হাঁদা, বুড়ো হলে আমার মতন সাবধান-সাবধান গোছের হবে। তাই তো আমার রাগ ধরে। ইচ্ছে করলেই লক্ষ্মী-ডাক্তারের মতন হতে পারো। হাফপ্যান্ট আর মাদ্রাজী চটি পরে ফলমূল খেয়ে তেজী-তেজী ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারো। তা নয়! আরে ছোঁড়া, ঐ তো টিকটিকির মতন শরীর, ছারপোকার মতন মন! অত ভয় কিসের? এতে অসুখ করবে, ওতে বকুনি খাবো, অত ভাবনা কেন? করো আরও, আর এই রকম চেহারা হবে। আজ মান্‌কি ক্যাপ, কাল মাথায় কম্বল মুড়ি। আরে হতভাগা তোর মতো একটা অপদার্থ মলেই বা কি?"

এই অবধি শুনে এমন রাগ হলো যে ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম।

তাতে এক আশ্চর্য কাণ্ড হলো।

চড়ের চোটে গাল ঘুরে গেলো। দেখি ওমা! সে লক্ষ্মীডাক্তার হয়ে গেছে! একগাল হেসে সেলাম ঠুকে বললে, "সাবাস বেটা! এই তো চাই।" বলেই কোথায় মিলিয়ে গেলো। আর তাকে দেখিনি। কিন্তু তারপর থেকেই লোকে আমায় বলে : "তেজী বুড়ো"।



দুপুরবেলা বাড়িসুদ্ধ সব্বাই ঘুমোচ্ছে। বাবা ঘুমোচ্ছেন, মা ঘুমোচ্ছেন, মেজমামা পর্যন্ত খবরের কাগজে মুখ ঢাকা দিয়ে বেজায় ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু টুনুর আর ঘুমই আসে না। তাকিয়ে দেখলো হাবুটা অবধি চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছে। তাকে ডাকা চলে না, মেজমামা যদি জেগে যান!

টুনু শুয়ে শুয়ে ভাবছে বাবার নতুন ঘোড়া খুব সুন্দর হলেও দাদামশায়ের বুড়ো ঘোড়া লালুর কাছে লাগে না। লালু কত কালের পুরনো, সেই কবে মেজমামা যখন ইস্কুলে যেতেন তখনকার! কি রকম প্রভুভক্ত! ওর গায়ে কী জোর! ভাবতে ভাবতে টুনুর মনে হলো—বাদলা দিন বলে বাবা আবার আজ ঘোড়ায় চড়তে বারণ করেছেন। বড়দের যদি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে! আচ্ছা, আজকের দিনই যদি ঘোড়া না চড়বে, তো চড়বে কবে!

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই টুনুর মুখটা হাঁ হয়ে গেলো, চোখ দুটো গোলমাল হয়ে গেলো। দেখলো দাদামশায়ের বুড়ো ঘোড়া লালু কেমন যেন মুচকি হাসতে হাসতে উঠোন পার হয়ে বাবার নতুন ঘোড়া রতনের আস্তাবলে ঢুকলো। টুনু উঠে এসে জানলার আড়ালে দাঁড়ালো। একটু বাদেই রতন লালু দুজনেই আস্তাবলের কোণ ঘুরে কোথায় যেন চলে গেলো।

টুনু ডাকলো : "ও কেশরী, ও সই-ই-স! লালু রতন যে পালিয়ে গেলো!" কিন্তু গলা দিয়ে আর স্বরই বেরুলো না। বাইরে এসে ইদিক উদিক তাকিয়ে যখন কেশরী সিং কিংবা সইসের পাত্তা পেলো না, টুনু নিজেই চললো আস্তাবলের কোণ ঘুরে রতন লালুর পিছন পিছন।

কী আশ্চর্য! আস্তাবলের পিছনে সেই সব ধোপাদের কুঁড়ে ঘর, তার সামনে নোংরা মাঠে ধোপাদের গাধা বাঁধা থাকতো, আর ময়লা দড়িতে সাহেবদের কোট পেন্টেলুন রোদে শুকুতো, সেই সব গেলো কোথায়? টুনু দেখলো দুপাশে গা ঘেঁষে ঘেঁষে সারি সারি দোকান। কোনোটা আলু-কাবলির, কোনটা লাল-নীল পেনসিলের, কোনোটা কাচের মার্বেলের। চারদিকে দোকানে দোকানে বড় বড় নোটিশ ঝোলানো।—

এগজিবিশন এদিকে

আর একটা দাড়িমুখো মোটকা বুড়ো একটা ফুটো বালতি পিটোচ্ছে আর ষাঁড়ের মতন গলায় চ্যাঁচাচ্ছে—"পয়সা না ফেলেই ঢুকে যান! পয়সা টয়সা কিচ্ছু চাই না গেলেই বাঁচি!

টুনু আরও এগজিবিশন দেখেছিলো, কত রকম আশ্চর্য জিনিষ থাকে সেখানে : দোকান, বাতিওয়ালা থাম, বায়োস্কোপ, নাগর-দোলা, গোলকধাঁধা!

তাই টুনু তাড়াতাড়ি চললো, মাঝপথে একটা যণ্ডামার্কা লোক পথ আগলে বললো, "এই য়ো!" টুনু তাকে দেখতেই পেলো না পায়ের ফাঁক দিয়ে সুট করে গলে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ একটা মস্ত খোলা জায়গায় উপস্থিত হলো, তার যেদিকে তাকায় কেবল ঘোড়া! বড় ঘোড়া, ছোট ঘোড়া, সাহেবের ঘোড়া, গাড়োয়ানের ঘোড়া! ভালো ঘোড়া, বিশ্রী ঘোড়া! আবার একটা মড়াখেকো হলদে ঘোড়া, ওলটানো টবে চড়ে গ্যাঁসগেঁসে গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে :

"হে ব্যাকুল ঘোড়াভাই-ভগিনী, আজ আপনারা কিসের জন্য এখানে আসিয়াছেন? পুরাকালে আপনারা বন-বাদাড়ে সুখে বিচরণ করিতেন, এই দুষ্ট মানুষগুলাই তো আপনাদের পাকড়াও করিয়া বিশ্রী গাড়িতে জুতিয়াছে। পায়ে নাল বাঁধাইয়া, পিঠে জিন চড়াইয়া দুইপাশে অভদ্রভাবে ঠ্যাং ঝুলাইয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ছিঃ! ছিঃ! আপনারা কি করিয়া এই দু'পেয়েদের কুৎসিত চেহারা সহ্য করেন?"

পিছন থেকে গাড়োয়ানদের ছোট ছোট ঘোড়াগুলো চেঁচিয়ে

উঠলো, "কক্ষনও সইবো না! সইবো না! সইবো না! মিটিং করে, রেজলিউসন করে, দানা না খেয়ে মানুষদের জব্দ করবো!" হলদে ঘোড়া ঠ্যাং তুলে ওদের চুপ করিয়ে দিল। টুনুর মনে হলো সে নিজের ছাড়া আর কারুর গলার আওয়াজ সইতে পারে না।

এক কোণে লালু রতন দাঁড়িয়েছিলো, হলদে ঘোড়া হঠাৎ লালুকে বললো, "আপনি প্রবীণ ব্যক্তি! আপনি কিছু বলুন।" বলবামাত্র লালু তড়বড় করে টব থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করলে :

"বহুকাল ধরে আমি চৌধুরীদের বাড়িতে থাকি। তাদের মতন ছোটলোক আর জগতে নেই—" টুনুর শুনে ভারি দুঃখ হলো। "তার উপর তারা এমন নিরেট মুখ্যু যে বড়বাবু পর্যন্ত সামান্য —যাক আমি কখনও কারও নিন্দে করি না। ওদের বাড়ির ছেলেগুলো আহাম্মুকের একশেষ। আমি শিক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছে করে ওদের কাপড় রোদে দিলে মাড়িয়ে দিই, জানলা দিয়ে ঘরে মুখ বাড়াই, বোকারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে চিনি খেতে দেয়, আর কেউ যখন দেখছে না গিন্নীর হিসেবের খাতা চিবিয়ে রাখি। তা ছাড়া নোংরা জিভ দিয়ে ওদের সইসের মুখ চেটে দিই, ছোট ছেলে একা পেলেই তেড়ে গিয়ে পা মাড়িয়ে দিই, এই রকম নানা উপায়ে জাতির মান রক্ষা করি।

"সবচেয়ে বিশ্রী ওদের টুনু আর হাবু বলে দুটো পোষা বাঁদর। অমন বদ চেহারার বাঁদর কেউ যে পোষে জানতাম না। ওরা আমা-



দের ঘুমের সময়ে এসে ঘেমো হাতে উলটো করে আমাদের গায়ে হাত বুলোয়, এমন ঘেন্না করে যে কী বলবো! আবার পাতায় করে যত অখাদ্য জিনিস এনে গদগদ হয়ে শুয়োরের মতো ছুঁচলো মুখ করে, চুকচুক শব্দ করে খাওয়াতে চেষ্টা করে— ইচ্ছে করে দিই ছেঁচে! কিন্তু অমন নিকৃষ্ট জীবকে মারতেও ঘেন্না করে।"

টুনু বিশ্বাসঘাতক লালুর কথায় অবাক হয়ে গেলো, এমন অকৃতজ্ঞতা দেখে তার বড্ড কান্না পেলো! ছি, লালুর জন্য দাদা-মশাই ভালো দানা আনান—সেকথা কই লালু তো বললো না! রতনের নতুন জিনের কথাও বোধ করি সে ভুলে গেছে! টুনু প্রতিজ্ঞা করলো আর কখনও আস্তাবলের দিকে যাবে না, ঘোড়া চড়তেও চাইবে না। লালুকে সে কতো ভালোবাসে আর লালুর তাকে নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে! টুনু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেই চমকে দেখলো, সে কখন জানি মেজমামার ঘরে এসে শুয়ে রয়েছে আর লালুটাও ইতিমধ্যে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেজমামার হাত থেকে চিনি খাচ্ছে!

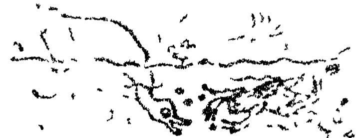
টুনুর বড্ড রাগ হলো, ডেকে বললো, "দিও না ওকে মেজমামা, ও বলেছে আমরা আহাম্মুক ছোটলোক, নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে!" মেজমামা "আহাঃ!" বলে টুনুকে চুপ করিয়ে দিয়ে একমনে চিনি খাওয়াতে লাগলেন। টুনু হাঁ করে দেখলো লালু



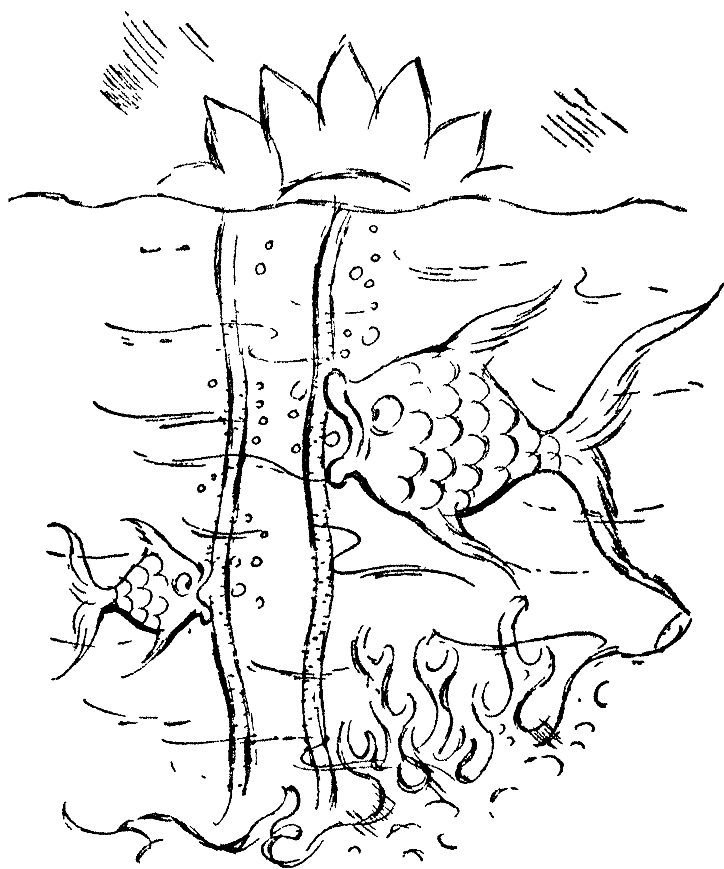
দিব্যি চিনি সাবাড় করলো, কিন্তু যাবার সময়ে মনে হলো চোখ টিপে জিভ বের করে বিশ্রী ভেংচে গেলো! কিন্তু সে কথা কাকেই বা বলে!



ক্যাবলাদের বাড়ির পুকুরে কোথায় এক গোপন জায়গায় সেই লাল নীল মাছটা ডিম দিয়েছিলো।—জানতো শুধু লাল নীল মাছ আর শঙ্কর মালী। ব্যাঙরা তাকে খুঁজে পায়নি। হাঁসরা তাকে খুঁজে পায়নি। ক্যাবলা



যেদিন শঙ্কর মালীর কাছে খবর পেলো সেই দিনই পুকুর পাড়ে ছুটে গিয়েছিলো কিন্তু সেও খুঁজে পায়নি। দেখলো ব্যাঙরা ডিম খুঁজে খুঁজে পুকুরের নীল জল ঘুঁটে ঘোলাটে করে দিয়েছে, হাঁসরা পদ্মফুলের মধ্যে প্যাতপেতে চামড়াওয়ালা ঠ্যাং চালিয়ে শেকড় বাকল পর্যন্ত তুলে এনেছে, কিন্তু ডিমের কোনোও পাত্তাই নেই।



ুড়ো হাঁসখুড়ো বলেছিলেন—“চোখ রাখিস, তা দেবার সময়ে গ্যাঁক করে ধরিস।” কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লাল নীল মাছটাকে

গোমড়া মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো, তা দেবার নামটি করলে না। সারা দুপুর মাছটা এখানে এক কামড় শেকড়, ওখানে দুটো কিসের দানা খেয়ে বেড়ালো, তা দেবার গরজই নেই!

হাঁসরা তো রেগে কাঁই! "আরে মশাই, আমরা ডিম দিলে ভর-সন্ধ্যে তার ওপর চেপে বসে থাকি। ত্রিসীমানায় কেউ এলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে যাই, আর এ দেখি দিব্যি আছে!"

ব্যাঙরা তাগ করে থেকে থেকে শেষটা ঝিমিয়ে এলো। হাঁসরা ম্যাদা মেরে গেলো. ক্যাবলাও দুতিনদিন ঘুরে গেলো।

শঙ্কর মালীকে অনেক পেড়াপীড়ি করাতে সে বললে—

"অ রাম-অ! সে বলিবাকু বারণ-অ অছি!"

ক্যাবলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, লাল নীল মাছটা ছোট ছোট ডানি-ওয়ালা পোকা ধরে ধরে কপাকপ গিলছে দেখলো। কি মোটকা মাছ বাবা। পাঁজরের একটা হাড় গোনা যায় না।

ক্যাবলার একটু দুঃখও হলো, পগারের মধ্যিখানে কে জানে কোথায় ডিম ফেলে লোকটা দিব্যি মাকড়গুলো মেরে খাচ্ছে। কাল হোক, পরশু হোক, যেদিনই হোক, মেজমামার মস্ত ছিপটা এনে এটাকে ধরবেই ধরবে। বামুনদিদিকে দিয়ে দেবে, ঝোল রেঁধে খাবে, কাঁটাগুলো বিল্লিকে খাওয়াবে।

এ তো গেলো ক্যাবলার কথা। এদিকে লাল নীল মাছটার ভাব-গতিক দেখে পুকুরের আর সবার গা জ্বলছে। শঙ্কর মালী ভাত দিলেই ও তেড়েমেড়ে আগে ভাগে গিয়ে সব সাফাই করে দেয়।

হাঁসরা সময় মতো উপস্থিতই হতে পারে না, ব্যাঙরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললে, তবু সে গ্রাহ্যই করে না।

শেষটা একদিন চাঁদনি রাতে লাল নীল মাছের ডিম ফুটে ছোট একটা ছানা বেরুলো। শঙ্কর মালী জানতো তাই দেখতে পেলো কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। আর ক্যাবলা তো ছিপই পায় না, মেজমামা সেটাকে ডাল-কুত্তোর মতন পাহারা দেন।
ছোট মাছটার কথা কেউ জানতে পারলো না। পদ্মফুলের বোঁটায় ছোট ছোট দাঁতের দাগ কারো চোখেই পড়লো না। ব্যাঙাচি-গুলোকে কে যে একা পেলেই ভয় দেখায়, ব্যাঙাচি বেচারাদের বোল ফোটেনি, তারা বলতে পারলো না, তারা কেবল দিনদিন ভয়ের চোটে আমসির মতন শুকিয়ে যেতে লাগলো। তাদের ল্যাজগুলো খসে যাবার অনেক আগেই নারকোল-দড়ি হয়ে গেলো।

এমনি করে আরও ক'দিন গেলো। তার পর বিকেল বেলায় ক্যাবলা ছিপ ছাড়াই পুকুর পাড়ে চললো। পথে দেখলো ওদের

তালগাছ থেকে সরসর করে কী একটা যেন নামছে, তার ঠ্যাং দুটো দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বাঁধা, পাঁচু ধোপার গাধার মতন, তার কোমরে দুটো হাঁড়ি ঝোলানো! ক্যাবলা ভাবছিলো লোকটাকে দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না, সট্‌কান দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় লোকটা তাকে ডাকলো।

ক্যাবলা দেখলো হাঁড়ির ভিতর শাদা ফেনা, তার গন্ধের চোটে ভূত ভাগে। লোকটা ক্যাবলার সঙ্গে অনেক কথা বললে, লাল নীল মাছের কথা শুনে, কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে গেলো। বললে ছিপের কি দরকার? ছোটবেলায় তারা নাকি কাপড় দিয়ে কচি কচি মাছ ধরতো। এখনও ছুটির দিনে সাঁওতালরা দল বেঁধে কোপাই নদীতে মাছ ধরে। তাদের ছিপ নেই, মাঝখানে ফুটো ধামার মতন জিনিস দিয়ে গপাক্‌ গপাক্‌ চাপা দিয়ে দিয়ে ধরে। কাছাড়ের কাছে কোথায় পাহাড়ী নদীতে রাত্রে নাকি জাল বেঁধে রাখে এপাড় থেকে ওপাড়, সকালে দেখে তাতে কতো মাছ, ছোট-গুলো ছেড়ে দেয় আর বড়গুলো ধরে নিয়ে যায়।

লোকটা এমনি কত কি বললো। যাবার সময়ে বলে গেল হাঁড়ির কথা যেন কাউকে না বলে।

সে চলে গেলে ক্যাবলা কাপড়ের খুঁট বাগিয়ে ঘটম্যাক ঘটম্যাক করে জলের দিকে চললো। আজ মাছ ব্যাটাকে কে রক্ষা করে? এমন সময় টুপ করে জল থেকে মাছের ছানা মুণ্ডু বের করে বিষম এক ভেংচি কাটলো। ওরে—বাবারে, সে কি মেছো ভেংচি! ক্যাবলা তো শাঁই শাঁই ছুট লাগালো, আর হাঁসরা ব্যাঙরা কে যে



কোথায় ভাগলো তার পাত্তাই নেই!

সন্ধ্যেবেলা শঙ্কর মালী যখন ওদের জন্য ভাত আনলো, দেখলো কেউ কোথাও নেই, খালি লাল নীল মাছ আর সবুজ ছানা পাশা-পাশি বসে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসছে।

খোকন কোথায়?

সকালে খুব দেরি করে উঠলাম। উঠেই গায়ের চাদরটা এক লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারই উপর দাঁড়ালাম। চটি খুঁজে পেলাম না। খালি পায়ে স্নানের ঘরে গেলাম। দাঁত মাজলাম না, তাতে যে সময়টুকু বাঁচলো সে সময়টা কলের মুখ টিপে ধরে পিচকিরির মতন দেয়ালে-টেয়ালে জল ছিটোলাম। খানিকটা আবার বাবার তোয়ালের উপরও পড়লো দেখলাম। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে, মুখহাত মুছে সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ঘরের কোনায় ছুঁড়ে মারলাম। তারপর একমুখ জল ভরে নিয়ে, শোবার ঘরে গিয়ে জানলা দিয়ে নিচে রাস্তায় একজন বুড়ো লোকের গায়ে পু—চ্ করে ফেলেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চুল-টাকে খুব যত্ন করে আঁচড়াতে লাগলাম।

ততক্ষণে নিচের তলায় মহা শোরগোল লেগে গেছে। পিসিমা

'ঘোতন কোথায়?'





'ঘোতন কোথায়?'

'প্রশান্তকুমার
কি আজ
পড়বে না?'



দুধের বাটি নিয়ে বলছেন : "ঘোতন কোথায় ?" মা আমার চটি-জোড়া নিয়ে বলছেন : "ঘোতন কোথায় ?" আর সব থেকে বিরক্ত লাগলো শুনে যে মাস্টারমশাইও সেই সঙ্গে ম্যাও ধরেছেন : "প্রশান্তকুমার কি আজ পড়বে না ?" ভীষণ রাগ হলো। জীবনে কি আমার কোনো শান্তি নেই ? এই সক্কাল বেলা থেকে সবাই মিলে পেছু নিয়েছে !

পিসিমাকে সিঁড়ির উপর থেকে ডেকে বললাম—দুধ খাবো না। সিঁড়ির নিচে মাকে এসে বললাম—চটি পরা ছেড়ে দিয়েছি। বসবার ঘরে গিয়ে গলা নিচু করে মাস্টারমশাইকে বললাম—মা বলে দিয়েছেন, আজ আমার পেট ব্যাথা হয়েছে, আজ আমি পড়বো না। তারপর একেবারে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সারাটা সকাল রোয়াকে রোদ্দুরে বসে বসে পা দোলালাম, আর রাস্তা দিয়ে যত ছ্যাকড়া গাড়ি গেলো তার গাড়োয়ানদের ভ্যাংচালাম।

দশটা বাজতেই উঠে গিয়ে বই-টই কতক কতক গুছিয়ে, আর কতক কতক খুঁজেই পাওয়া গেলো না বলে ফেলে রেখে, ঝুপ ঝুপ করে একটু স্নান করে নিয়ে, খুব যত্ন করে চুলটা ফের আঁচড়ে নিয়ে খাবার ঘরে গেলাম।

মা জলের গেলাশ দিতে দিতে বললেন : "হ্যাঁরে মাস্টারমশাই কখন গেলেন। শুনতে পেলাম না তো ?"

আমি সত্যি করেই বললাম : "সে ক-খ-ন চলে গেছেন কেবা তার খবর রাখে !"

ভাত কতক খেলাম, কতক চার পাশে ছড়ালাম, কতক পুসিকে দিলাম, আর কতক পাতে পড়ে রইলো। মাছটা খেলাম, ডাল খেলাম, আর ঝিঙে, বেগুন ইত্যাদি রাবিশগুলো সব ফেলে দিলাম। মা রান্নাঘর থেকে দেখতেও পেলেন না। ট্রামভাড়াটা পকেটে নিয়ে মাকে বললাম : "মা, যাচ্ছি।" এই পর্যন্ত প্রায় রোজই যেমন হয় তেমনই হলো। অবিশ্যি মাস্টারমশাইর ব্যাপারটা রোজ হয় না, তাই যদি হতো তাহলে বাবাটাবাকে বলে মাস্টার-মশাই এক মহাকাণ্ড বাধাতেন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এরপর থেকে সেদিন সব যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেলো। মনে আছে ট্রামে উঠে ডান দিকের একটা কোনা দেখে আরাম করে বসলাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি আর খালি মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে দেখছে। একবার ট্রামসুদ্ধ সবাইকে দেখে নিলাম, বুঝতে পারলাম না কে। তারপর আবার যেই বাইরে চোখ ফিরিয়েছি আবার মনে হলো কে আমাকে এমন করে দেখছে যে আমার খুলি ভেদ করে ব্রেন পর্যন্ত দেখে ফেলছে। তাইতে আমার ভারি ভাবনা হলো। এমনিতেই নানান আপদ, তার উপর আবার ব্রেনের ভিতরকার কথাগুলো জেনে ফেললে তো আর রক্ষে নেই।

কিছুতেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। আবার মাথা ঘুরিয়ে ট্রামের প্রত্যেকটি লোককে ভালো করে দেখলাম।

এবার লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার সামনে কালো পোশাক পরা একটি অদ্ভুত লোক। তার মুখটা তিনকোনা মতন, মাথায় গাধার

টুপির মতন কালো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে লাল নীল হলদে সবুজ চক্ড়াবক্ড়া তারা-চাঁদ আঁকা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা কালো জুতো, দুই হাঁটুর মাঝে হাতে ঝুলছে একটা সন্দেহজনক কালো থলে।

এরকম লোক সচরাচর দেখা যায় না। অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভীষণ চমকে উঠলাম। দেখলাম মাথায় টুপি নয়, চুলটাই কিরকম উঁচু হয়ে বাগিয়ে আছে। গায়ে সাধারণ ধুতির উপর কালো আলোয়ান, তাতে ট্রামের ছাতের কাছের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙ বেরঙ হয়ে আলো পড়েছে। আর পায়ে নাকতোলা বিদ্যাসাগরী চটি। খালি হাতের থলেটা সেই-রকমই আছে।

কিরকম একটু ভয় ভয় করতে লাগলো।

লোকটা খুশি হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর স্পষ্ট গলায় বললো : "অতই যদি খারাপ লাগে ইস্কুলে যাও কেন? বড়রা যখন এতই অবুঝ তাদের কথা মেনে নাও কেন?"

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে জিগগেস করলাম : "তবে কি করবো?"

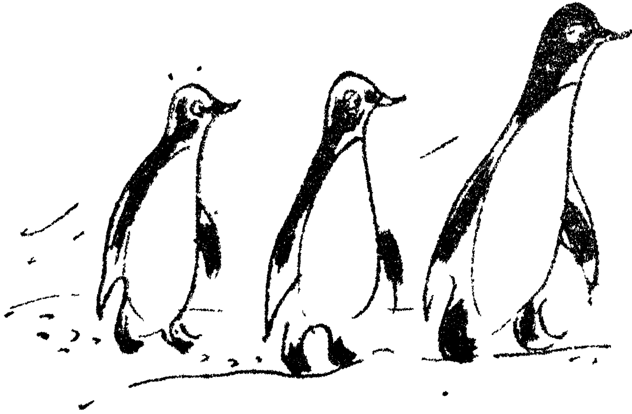
লোকটি বললো : "কি করবে? তাকিয়ে দ্যাখো নীল আকাশে ছোট ছোট শাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা সব ভিজে পাতায় সোনালী রঙের রোদ মেখে বসে আছে। গড়ের মাঠের ধার ঘেঁষে পুকুরটাকে দ্যাখো, ঘোর সবুজ জলে টলমল করছে। আর, টের পাচ্ছো দখিন হাওয়া দিচ্ছে?"



তারপর লোকটা তার বড় বড় ফুটোওয়ালা নাকটা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকে বললো . "হুঁ, পেঙ্গুইনের গন্ধ পাচ্ছি। গড়ের

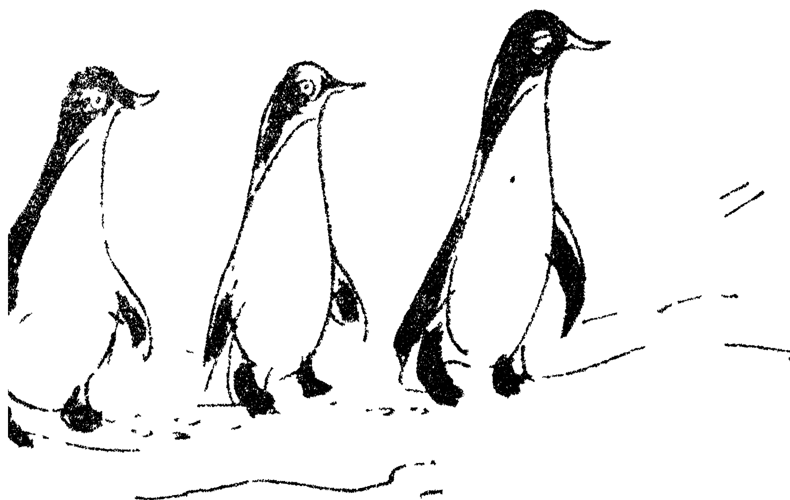
মাঠের ওপারে, গঙ্গার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের ওপারে, ভারত-মহাসাগরের ওপারে, কোন একটা বরফজমা দ্বীপের উপর সারি সারি পেঙ্গুইন চলাফেরা করছে, তাদের মুখেচোখে রোদ এসে পড়েছে, ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে, দু-একটা শাদা নরম পালক উড়ে গিয়ে এখানে ওখানে পড়ছে—দেখতে পাচ্ছো না ?"

কি আর বলবো, তখন আমি যেন স্পষ্ট ঐ সব দেখতে পেলাম, আর আমার সমস্ত মনটা আনচান করে উঠলো। মনে হলো এমন দিনে কি কেউ ইস্কুলে যায় ? এমন পৃথিবীতে কোনো দিনও কেউ ইস্কুলে যায় ?



আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে আরেকটু আস্তে আস্তে বললো : "জানো ভোর রাতে বড় বড় চিংড়িমাছ ধরতে হয়, তার এক একটার ওজন একসেরের বেশি। দুদিন ধরে সমুদ্রের নিচে দড়ি-বাঁধা সব হাঁড়ার মতন ডুবিয়ে রাখতে হয়। আর ভোরবেলা গিয়ে ঐ দড়ি ধরে টেনে হাঁড়াশুদ্ধ চিংড়ি তুলতে হয়। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় আস্তে আস্তে সকাল হয়। তুমি তো জানো যে পুব দিকে সূর্য ওঠে, কিন্তু একথা জানো কি যে পশ্চিম দিকের আকাশটা আগে লাল হয়, তারপর পুব দিকে সূর্য ওঠে। তারও পর পশ্চিমদিকের



লাল রঙ মিলিয়ে যায়, আর সমস্ত আকাশটা ফিকে পোড়া ছাই-য়ের মতন হয়ে যায়। তারাগুলোকে নিবে যেতে কখনো দেখেছো কি ?”

আমার মনে হলো আমার নিশ্চয় এখানে কিছু বলা উচিত কিন্তু আমার জিভ দেখলাম শুকিয়ে কাঠের মতন হয়ে গেছে। কিছু আর বলা হলো না। খালি মনটা হু হু করতে লাগলো। সে লোকটা আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বললো : “কি জন্য কলকাতায় পড়ে থাকো আর ইস্কুলে যাও ? জানো রবিঠাকুর ইস্কুল পালিয়ে পালিয়ে অত বড় কবি হয়েছিলেন ! আর জানো, সাঁওতাল পরগনায় যখন মহুয়া গাছের ফল পাকে, তার গন্ধে জঙ্গলসুদ্ধ সব জিনিসে নেশা লেগে যায়। আর বনের ভাল্লুক-গুলো মহুয়া খেয়ে খেয়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কাঠুরেরা তাদের ঐরকমভাবে দেখতে পায়। তুমি জানতে যে মহুয়া ফল খেলে নেশায় ধরে ?”

আমার তখন মনে হলো দিনের পর দিন ইস্কুলে গিয়ে আমি বৃথাই জীবন নষ্ট করছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় কখনও ইস্কুলেই যায়নি।

হঠাৎ দেখি সে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার দিকে ফিরে অম্লান বদনে, বললো, “এসো।” এমন করে বললো যেন বহুক্ষণ থেকে ঐ রকমই কথা ছিলো। ও-ও নামবে আর সেই সঙ্গে আমিও নামবো।

আমি নামলাম। যদিও আমি জানতাম অচেনা লোক ডাকলে সঙ্গে যেতে নেই। যদিও দিনের পর দিন পিসিমা বলেছেন—

দুষ্টু লোকেরা বলে : "মণ্ডা খাবি?" "সার্কাস দেখবি?" এই সব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে হয় আসামের চা বাগানে চালান দেয়, নয় ঘোর জঙ্গলে মা-কালীর কাছে ঘ্যাঁচ করে বলি দেয়।

তবুও আমি নামলাম। কারণ রোজ রোজ ঐ ঘুম থেকে ওঠা, দাঁত মাজা, পড়া তৈরি করা, স্নান করে ভাত খাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, ইস্কুল থেকে সারাটা দিনমান নষ্ট করে বিকেলে আবার বাড়ি ফেরা, সেই খাওয়া, সেই শোয়া—ঐরকম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—যতদিন না অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, কবে আমি বড় হয়ে ভালো চাকরি করে এই সব জিনিসের ভালো ফল দেখাবো—ও আর আমার সহ্য হচ্ছিলো না।

বইগুলো ট্রামের কোনায় আমার জায়গায় পড়ে রইলো। আমি সেই লোকটাব সঙ্গে গেলাম।

তখন মোড়েব ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজেছে।

সে আমাকে একটা চায়ের দোকানের ভিতর দিয়ে পিছন দিকের ছোট একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে আমাকে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে কোথায় জানি চলে গেলো। একটু পরেই সে আবার ফিরে এলো, সঙ্গে একটা একচোখো লোক, অন্য চোখটার গায়ে একটা সবুজ তাপ্পি মারা। একটা পা আছে, আরেকটা পা কাঠের তৈরি।

এই লোকটা আমার দিকে একচোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো : "কি হে ছোকরা, পড়াশুনোর উপর নাকি এমনই

ঘেন্না ধরে গেছে যে একেবারে সে সব ত্যাগ করে এসেছো?"

তার গলাটা এমন কর্কশ আর চেহারাটাও এমন বিশ্রী যে আমি সত্যি ভারি ভড়কে গেলাম।

কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকাতেই সে গ্রামোফোনের চাকতির মতো বলে যেতে লাগলো—"পড়াশুনো করে কি হবে? জানো, আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যেসব বিরাট বিরাট নদী আছে তার ধারে ধারে কুমিরেরা আর হিপ্পোপটেমাসরা শুয়ে শুয়ে দিন কাটায় আর লম্বা লাল ঠ্যাং-এ ভর দিয়ে গোলাপী রঙের ফ্ল্যামিংগো পাখিরা রোদ পোয়ায়? আর ঐ সব জঙ্গলের মধ্যে এমন বিশাল বিশাল অরকিড জাতের ফুল ফোটে যে তার মধ্যে একটা মানুষ দিব্যি আরামে শুয়ে থাকতে পারে!"

বুঝতে পারছিলাম এ লোকটা যাদু জানে। কারণ তক্ষুনি আমার ভয়টয় কোথায় উড়ে গেলো—অন্য লোকটাকে জোর গলায় বললাম : "হ্যাঁ, সে সব চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছি।"

লোকটা হাসলো, বললো : "চিরদিন বড়ো দীর্ঘকাল হে ছোকরা। চিরদিনের কথা কে বলতে পারে? কিন্তু তোমার সাহস আছে, উৎসাহ আছে, তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। স্বাস্থ্যটাও তো ভালো দেখছি। আশা করি বাড়ির জন্য মনের টান ইত্যাদি কোনো দুর্বলতা নেই?"

হঠাৎ মনে হলো মা এতক্ষণে স্নানের যোগাড় করছেন, বাবা আপিস গেছেন, এবং দুজনেই মনে ভাবছেন আমি বুঝি ইস্কুলে গেছি। গলার কাছটা সবে একটু ব্যাথা করতে শুরু করেছিলো



এমন সময় কালো কাপড় পরা লোকটা বললো : "ইস্কুলের বাইরে, বাড়ির বাইরে, কলকাতা থেকে বহুদূরে নরওয়ের উত্তরে চাঁদনি রাতে হারপুন দিয়ে তিমি শিকার হয়। তিমির গায়ে হারপুন

বিঁধলে তিমি এমনি ল্যাজ আছড়ায় যে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে যায়। কত নৌকো ডুবে যায়। আবার তিমি মরে গিয়ে যখন উলটে গিয়ে ভেসে ওঠে দেখবে তার বুকের রঙটা পিঠের চেয়ে ফিকে। আর, জানো, ইংল্যাণ্ডে শীতকালে সোয়ালো পাখিরা থাকে না। তারা দলে দলে উড়ে স্পেনে চলে যায়, আর যেই শীত কমে আসে আবার তারা দলে দলে সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত গতিতে উড়ে ফিরে আসে। এসে দেখে তাদের আগেই শীতের বাতাসকে তুচ্ছ করে ড্যাফোডিল ফুলরা ফুটে গেছে।"

আমার মন পাখির মতন উড়ে যেতে চাচ্ছিলো।

একচোখো বললো : "কিন্তু শুধু তিমি মারলে হবে না। তার বহু অসুবিধাও আছে, বহু দূরও। এই কাছাকাছি মানুষটানুষ মারতে পারবে? পরে যাবে অ্যাফ্রিকা, নরওয়ে, আলাস্কা-- আপাতত অন্ধকার রাত্রে গলির মুখে দাঁড়িয়ে বাঁকা ছুরি হাতে নিয়ে ঘচ করে সেটাকে লোকের বুকে আমূল বসিয়ে দিতে পারবে? যেমন রক্তের নদী ছুটবে তুমিও হো হো করে রাত কাঁপিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠবে? মাথায় বাঁধা থাকবে লাল রুমাল?"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সেই কালো কাপড় পরা লোকটা বললো : "উত্তর মেরুতে সীল মাছেরা বরফের মধ্যে বাসা করে—"

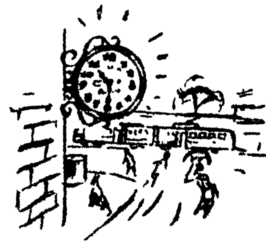
আমি বললাম : "কুড়ি বছর পরে উত্তর মেরুর কথা শুনবো, এখন আমি ইস্কুলেই বরং যাই, মাথায় আমি লাল রুমাল কিছুতেই বাঁধতে পারবো না।"

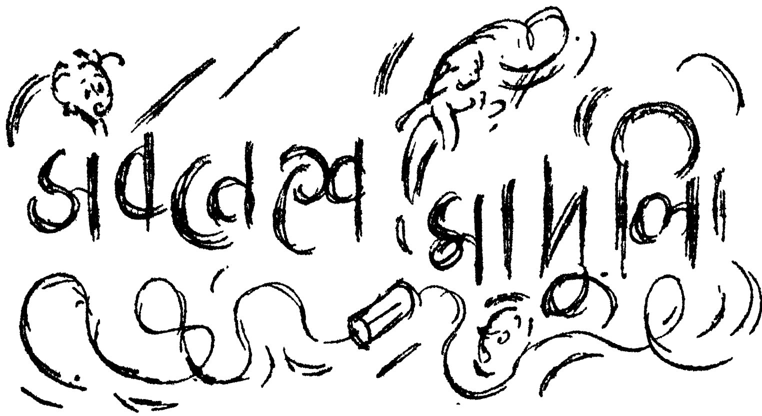
লোকটা বললো : "কে জানে ভুল করছো কিনা?"

আমি ততক্ষণ চায়ের দোকানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। প্রথম যে ট্রাম এলো তাতেই উঠে পড়লাম। উঠেই ভীষণ চমকে গেলাম। দেখলাম ট্রামের কোনায় ডানদিকের সিটে আমার বইগুলো পড়ে রয়েছে। কেমন করে হলো বুঝতে না পেরে ফুটপাথে চায়ের দোকানের সামনে কালো কাপড় পরা লোকটার দিকে তাকালাম।

আবার মনে হলো তার মাথায় গাধার টুপির মতো টুপি, গায়ের কালো পোশাকে রঙবেরঙের চক্‌ড়াবক্‌ড়া আঁকা, আর পায়ে শুঁড়তোলা কালো যাদুকরের জুতো।

সে আমাকে হাত তুলে ইশারা করে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। আর আমি মোড়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখনোও সাড়ে দশটাই বেজে রয়েছে!





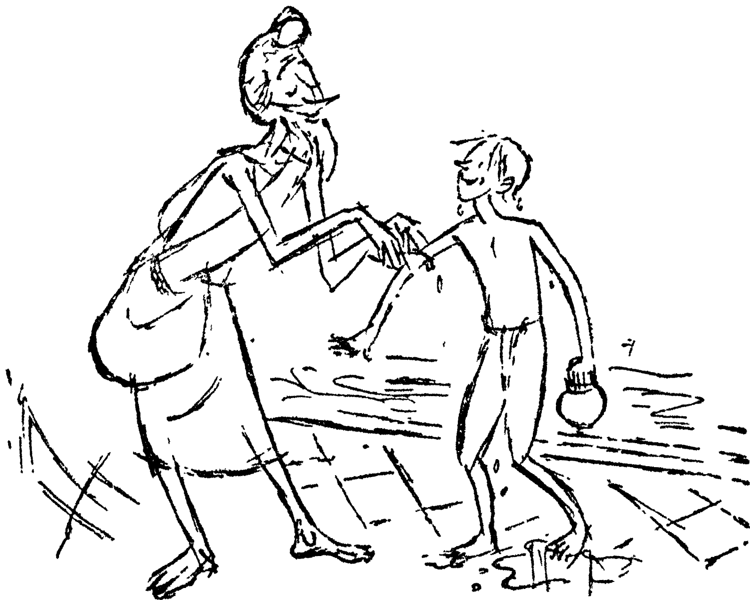
পুজোর ছুটির পর যখন স্কুল খুললো, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম গুপে ডান হাতে মাদুলি বেঁধে এসেছে। কনুইয়ের একটু উপরে ময়লা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা চকচকে এক মাদুলি। আমি ভাবলাম সোনার বুঝি, কিন্তু গুপে পরে বললো নাকি পেতলের। ঘাম লেগে লেগে সোনার মতো হয়ে গেছে।

টিফিনের সময় জিগগেস করলাম, "কেন রে?" তাতে সে এক আশ্চর্য কথা বললো।

তার দাদামশায়ের নাকি যখন অল্প বয়েস, একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের তলায় চকচকে এক কুচকুচে কাগের পালক। প্রথমটা খুব খুশি হলেন। ভাবলেন দিব্যি এক খাগের কলম বানিয়ে বন্ধুদের লম্বা লম্বা চিঠি লেখা যাবে। পরে শিউরে উঠলেন। কি সর্বনাশ! কাগ যে ছুঁতে নেই, ইয়ে-টিয়ে খায়, তার

পালক ব্যালিশের তলায় এলো কোত্থেকে? আর কেউ দেখবার আগেই সেটাকে জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে উঠোনে ফেলে দিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তার পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের নিচে আবার আরেকটা কাগের পালক! এবার আর কোনও সন্দেহই নেই, দস্তুরমতো কাগ কাগ গন্ধ পর্যন্ত পেলেন। দাদা-মশাই সেইদিনই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন, চুল ন্যাড়া



করলেন, পাশের বাড়ির লোকদের তাদের গাছ-ছাঁটা কাঁচিটা ছ'মাস বাদে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন, গঙ্গাস্নান করলেন।

স্নান করে উঠে, ঘাটের উপর দেখেন দিব্যি ফোঁটা কাটা, তিলক আঁকা, জটাওয়ালা, গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী বাবা হাসিহাসি মুখ করে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। দাদামশাই তাঁকে ঢিপ করে প্রণাম করলেন। অমনি সন্ন্যাসী তাঁর ডান হাতের কনুইয়ের উপর ঐ লাল সুতো দিয়ে মাদুলিটা বেঁধে দিয়ে, দাদামশায়ের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "কুচ্ ডর নেই বেটা। শাঁপখোঁপ সব কেটিয়ে যাবেন।"

দাদামশায়ের ঘাড়ে খুব সুড়সুড়ি লাগা সত্ত্বেও তিনি শুধু একটু কিলবিল করে বললেন, "ঠিক বলছো তো ঠাকুর ?"

গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলির মধ্যে থেকে সুতো বাঁধা এক চশমা বের করে নাকে পরেই আঁতকে উঠে বললেন, "য়্যাঁ! এ কি আছে রে ? আরে হামি তো তোমাকে চিনতে পারেনি, উ মাদুলি পলটু জমাদার কো আস্তে বনায়া, দে দেও রে বেটা, উ তোমারা নেহি।"

কিন্তু কে শোনে ? দৈবাৎ অমন মাদুলি মানুষের জীবনে এক আধবার ঘটে যায়। তাকে কি অমনি অমনি দিয়ে দেওয়া যায় ? দাদামশাই ছপাত করে মালকোঁচা মেরে দে দৌড়!

বাড়ি এসে অবাক হয়ে দেখলেন পাশের বাড়ির আমগাছের যে ডাল পাকা পাকা আমশুদ্ধ তাঁদের উঠোনের উপর ঝুলছিলো, অথচ পাছে নেপালবাবু পুঁতে ফেলেন সেই ভয়ে কিছু করা

যাচ্ছিলো না, সে সব আম আপনি আপনি দাদামশায়ের উঠোনে পড়ে গেছে। দেখা গেলো নতুন কুয়োতেও ভোর থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আসছে। রাত্রে ফেলা-দা পুকুরে যে ছিপ ফেলে রেখেছিলো তাতে মস্ত এক কাতলা মাছ পড়েছে। বেলা না হতেই দাদা-মাশায়ের শালা, গত বছর যে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিলো, নিজে থেকে ফেরত দিয়ে গেলো। উপরন্তু রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন করে গেলো। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখলেন এমন কি দিদিমার পর্যন্ত হাসিমুখ।

মাদুলির গুণ দেখে দাদামশাই অবাক। মনে মনে সন্ন্যাসী বাবার ময়লা পায়ে শত শত প্রণাম করলেন।

সে থেকে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গেলো। টাকা-পয়সা হলো, গরু-ভেড়া হলো. ছেলেরা বড় বড় চাকরি পেলো, মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ে হলো। এমন কি মামার বাড়ির গরুর দুধের ক্ষীর, গাছের আম, আর পুকুরের মাছের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনার চোটে গুপে "লোম-হর্ষণ সিরিজ" এর বিশ নম্বর বইয়ের পাঁচ ছ'টা পাতার কোনা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললো।

আরও বললো : "এই সেই মাদুলি। একচল্লিশ বছর এক মাস দাদামশায়ের হাতে বাঁধা ছিলো, একদিনের জন্যও খোলা হয়নি, দাদামশায়ের হাতে সুতো বাঁধা মাদুলির শাদা দাগ পড়ে গেছে, গায়ে লেগে শেষটা এমন হয়েছিলো যে মাঝেমাঝে নাকি মাদুলি-টার উপরও চুলকতো!"

সেই মাদুলি দাদামশাই এক কথায় গুপের হাতে বেঁধে দিয়েছেন

কারণ গুপে বায়না ধরেছিলো যে মাদুলি না দিলে নাকি সে তেলও মাখবে না, চানও করবে না, ভাতও খাবে না। আর নেহাত যদি খায়ও তাহলে এত কম খাবে যে কিছুদিন বাদে পেট না ভরে ভরে হাত-পা ঝিমঝিম করবে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে, চোখ উল্‌টে যাবে—এই অবধি শুনেই দাদামশাই কানে হাত দিলেন ও তখুনি পট্‌ করে মাদুলির সুতো ছিঁড়ে সেটাকে গুপের হাতে বেঁধে দিলেন।





গুপে দেখলে মাদুলির গুণ একটুও কমেনি। আধ ঘণ্টার ভিতর ছোট মামার ফাউণ্টেন পেনের নিব খারাপ হয়ে গেলো, ছোটমামা সেটা গুপেকে দিয়ে দিলো। পরে অবিশ্যি আবার চেয়েছিলো, তাইতেই তো গুপে ছুটির দুদিন বাকি থাকতেই মামাবাড়ি থেকে চলে এসেছিলো।

বাড়ি এসেই শোনে মাস্টারমশাইর মাম্পস হয়েছে, গাল ফুলে চালকুমড়ো, সেরে যদি বা ওঠেনও তবু একটি মাসের ধাক্কা।

এরপর গুপে যা তা বলতে আরম্ভ করলো। নাকি মাদুলি হাতে পরা থাকলে গুপে যখন যা বলবে তাই ঘটতে বাধ্য। একথা শুনে আমরা সবাই ভীষণ আপত্তি করলাম, তা কি কখনও হয় ?

নগা বললে, "এক যীশু ছাড়া আর কেউ——"

গুপে ভীষণ রেগে সরু লম্বা ময়লা নখওয়ালা একটা আঙুল নগার দিকে বাগিয়ে বললো, "আজ বলে দিলাম তুই ভূগোল ক্লাশে দাঁড় খাবি।"

ওমা ! সত্যিসত্যি ভূগোল ক্লাশে নগা দাঁড় তো খেলোই, তার উপর কান মলাও খেলো !-এর পর আর কারুর কিছু বলবার যো নেই। গুপে একবার মাদুলির দিকে তাকালেই হলো, সে যখন যা বলে সবাই তা মেনে নেয়। যখন যা চায় সবাই তাই দিয়ে ফেলে।

তিন সপ্তাহ ক্লাশ শুদ্ধু সবাই গুপের দৌরাত্ম্যে খাবি খেলাম। সে যা খুশি তাই করতে আরম্ভ করলো। এমন কি কালীপদর চুল ছাঁটা পছন্দ হচ্ছিলো না বলে সে বেচারাকে ন্যাড়া করিয়ে ছাড়লো।

সবাই দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলাম। নগার তো পেণ্টেলুন এমন ঢিলে হয়ে গেলো যে শেষে তার দাদা তাই নিয়ে টানাটানি। বলে কিনা—"দেখছিস না, ও আমার, তোর গায়ে বড় হচ্ছে। হয় আমার, নয় বাবার।"

এদিকে যার যা ভালো জিনিস গুপে সব গাপ করতে লাগলো। পেনসিল, রবার, পেনসিলকাটা, রঙিন খড়ির বোঝায় গুপের পকেট ঝুলে ঝুলে ছেঁড়ে আর কি! শেষে কিনা সে সব রাখবার জন্য আমার নতুন টিফিনের বাস্কটা একদিন চেয়ে বসলো। তখন আমি বেজায় চটে গেলাম। একটু তোতলামি এসে গেলো। মাথা-টাথা নেড়ে বললাম—"দ্যা-দ্যাখ গুপে, দিন দিন তোর বাড় বাড়ছে। কাল তোর সব অঙ্ক কষে দিয়েছি। আমার টিফিনের অর্ধেকের বেশি খেয়ে ফেলেছিস। ইংরেজি ক্লাশে ছুরি ফটফট করেছিস আর তার জন্য বকুনি খেয়েছি আমি। বেশি বাড়াবাড়ি করিসনে বলে দিলাম!"

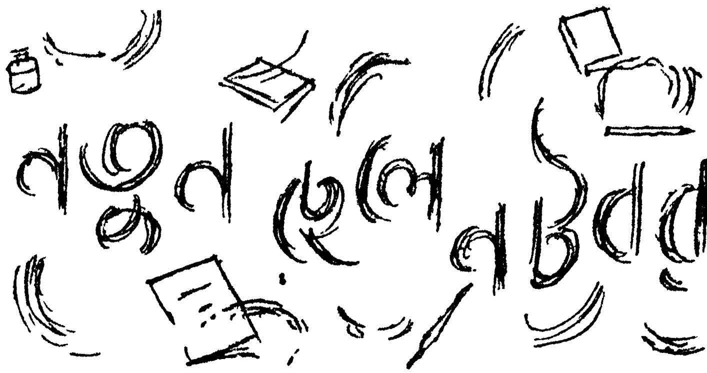
এক নিঃশ্বাসে রাগের মাথায় এতগুলো কথা বলে দেখি গুপে আমাকে শাপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তার চোখ দুটো ছোট হয়ে হয়ে আলপিনের ডগার মতো হয়ে গেলো, ঢোক গিলে, গলা হাঁকড়ে, আঙুল বাগিয়ে, খনখনে গলায় বললো—"আজ তোর জীবনের শেষদিন। দিনটা কাটলেও রাত কাটবে না।" ক্লাশময় একটা থমথমে চুপচাপ। তার মধ্যে নরেনবাবু এসে গেলেন, আর কিছু হলো না।

একটু পরেই আমার গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসতে লাগলো,

নিঃশ্বাসটা কি রকম জোরে জোরে পড়তে লাগলো, চুলের গোড়াগুলো শিরশির করতে লাগলো, পেটের ভিতর কেমন ফাঁকাফাঁকা মনে হতে লাগলো। বুঝলাম মাদুলির শাপ আমার লেগেছে। কিছু পড়া-টড়া শুনলাম না, হোমটাস্ক টুকলাম না, ড্রইং ক্লাশে বেয়াদপি করলাম। যার দিন কাটলেও রাত কাটবে না, তার আবার ভাবনা কি? টিফিন বাস্কটা ক্লাশের মধ্যেই নগার হাতে ঠুসে দিলাম, আমি মরি আর গুপে সেটা ভোগ করুক আর কি! ছুটির ঘন্টা পড়লে পর মনে হলো, আমি তো গেলাম, যাবার আগে ঐ সর্বনেশে মাদুলিটাকে শেষ করে তবে যাবো।

দেখি গুপেদের পুরনো চাকর ভন্দু গুপের বই গুছিয়ে নিচ্ছে, আর গুপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। হঠাৎ খুন চড়ে গেলো, ছুটে গিয়ে এক সেকেণ্ডে মাদুলিটা কেড়ে মাড়িয়ে ভেঙে একাকার! তার থেকে অন্তত ধোঁয়াও বেরুনো উচিত ছিলো, কিন্তু কিছু হলো না। গুপে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু ওদের চাকরটা হাঁই হাঁই করে ছুটে এসে হাত-পা ছুঁড়ে বললে—"য়্যাঁ, কি করলে! আমার পেটব্যাথার অব্যর্থ মাদুলি, আমি কালীঘাট থেকে দু'পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি। আগেই জানি গুপী দাদাকে যা দেওয়া যাবে তাই আর কিছু থাকবে না!"

আমরা সবাই হাঁ করে গুপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নিশ্চয় কিছু বলা উচিত ছিলো, কিন্তু সে অম্লানবদনে পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে ভন্দুকে ছুঁড়ে দিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বাড়ি চলে গেলো।



সেই ছেলেটা প্রথম যেদিন মাস্টারমশায়ের পিছন পিছন ক্লাশে ঢুকলো, গায়ে নীল ডোরাকাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফ-প্যাণ্ট, চুলগুলো লম্বা হয়ে নোটানোটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তেল-চুকচুকে আহ্লাদে আহ্লাদে বোকা মতন ভাব-খানা—দেখেই আমার গায়ে জ্বর এলো। আবার আমোদও লাগলো, একে নিয়ে বেশ একটু রগড় করা যাবে মনে করে।

ছেলেটার পায়ে ফিতে দেওয়া কালো জুতো একটু কিচকিচ করছিলো, তাইতে নগা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, "জুতোর দামটা বুঝি আসছে মাসে দেওয়া হবে?"

ছেলেটা কিন্তু কিছু না বলে খাতা পেনসিল নিয়ে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে চুপ করে বসলো। মাস্টারমশাই বললেন, "ওহে নটবরচন্দ্র, বছরের মাঝখানে এয়েচো, ভালো করে পড়াশোনা কোরো।" নাম



শুনে আমরা তো হেসেই কুটোপাটি, নগা তক্ষুনি তার নাম দিয়ে ফেললো—"লটবহর"। সত্যি নগার মতন রসিক ছেলে খুঁজে পাওয়া দায়!

টিফিনের সময় নটবরচন্দ্র একটা ছোট্ট বইয়ের মতন টিনের বাক্স খুলে লুচি আলুর দম খেয়ে, হাত চাটতে চাটতে বার বার আমাদের দিকে তাকাতে লাগলো। তাই না দেখে নগা বললে, "কি রে ছোঁড়া, মানুষ দেখে বুঝি অভ্যেস নেই?"

আমরা তাগ করেছিলাম, চটেমটে ছেলেটা কি করে দেখবো। ছেলেটা কিন্তু খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখে হাত দিয়ে বিশ্রী রকম ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে লাগলো। নগা রেগে বললো—"অত হাসির কথা কি হলো শুনতে পারি?"

ছেলেটা অমনি নরম সুরে বললো—"কিছু মনে কোরো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয়নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজমামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। কেবল ঐ ওকে ছাড়া"—বলে আমাকে দেখিয়ে দিলো।

নগারা রেগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না, অল্প হেসে জিগগেস করলাম—"আর আমাকে দেখে কিসের কথা মনে হচ্ছে?"

সে অম্লানবদনে বললে—"মুলতানী গরুর কথা।" ভীষণ রাগ হলো। ভাবলাম ছোটবেলা থেকে এই যে শ্যামবাবুর কাছে স্যাণ্ডো শিখেছি সে কি মিছিমিছি! তেড়ে গিয়ে এইসা এক প্যাঁচ কষে দেবার চেষ্টা করলাম যে কি বলবো! সে কিন্তু কি একটা ছোট-

লোকি কায়দা করে এক সেকেণ্ডে আমাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। ঠিক তক্ষুনি ক্লাশের ঘণ্টা পড়লো, নইলে তাকে বিষম সাজা দিতাম।

ক্লাশের পর বাড়ি যাবার পথে তার জন্য ওৎ পেতে রইলাম, আমি আর একটা ছেলে। দেখা হতেই সে হাসিমুখে বললো, "কি হে, চীনাবাদাম খেতে আপত্তি আছে ?" আমরা আর কি করি একেবারে তো আর অভদ্র হতে পারি না, তাই চীনাবাদাম নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম—"দেখ্, নতুন ছেলে এসেছিস, নতুন ছেলের মতো থাকবি, আজ দয়া করে তোর চীনাবাদাম খেলুম বলে যেন মনে করিস না যে দুপুরের কথা ভুলে গেছি।"

সে বললে, "রাগ কোরো না ভাই। আমি যদি জানতাম অমন হোঁতকা শরীর নিয়েও তুমি এমন ল্যাদাড়ে তবে কি আর কষ্ট করে জনসোনিয়ান প্যাঁচ লাগাতাম, এই এমনি দু'আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতাম।" এই বলে আমাকে কি একটা কায়দা করে চিতপাত করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সে তো হাওয়া! এর থেকেই বোঝা গেলো সে কী ভীষণ ছেলে! সারারাত মাথা ঘামিয়েও তাকে জব্দ করবার উপায় দেখলুম না। পরদিন সকালে ছোটমামা বললো, "কি রে ভোঁদা, মুখ শুকনো কেন? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? রোজ বলি অত খাসনি।" যা বুদ্ধি এদের! বললুম—"যে বিষয়ে কিছু বোঝো না, সে বিষয়ে কিছু বলতে এসো না।"

নটবরকে না পারতে পারি, তাই বলে যে অন্যদেরও এক কথায়



চুপ করিয়ে দিতে পারি না, একথা যেন কেউ মনে না করে। হাবুটার কাছ থেকেও কোনও সাহায্য পাওয়া গেলো না। নিজের বেলা তো খুব বুদ্ধি খোলে, কিন্তু আমি যখন সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম সে উলটে বললে, "তুই আর তোর নগা না বগা, দুটি মানিকজোড়! আমার কাছে যে বড় পরামর্শ চাইতে এসেছিস! ওরে ছোঁড়া, আগে পরামর্শ নেবার মতন একটু বুদ্ধি গজা!"

নাক সিঁটকে চলে এলুম। হ্যাঁ! পরামর্শ আবার কি! মেয়েদের

সঙ্গে আবার পরামর্শ! জানে তো কেবল হি হি করে হাসতে আর কালো গায়ে লাল জামা চড়িয়ে সং সাজতে! সাধে কি মুনি-ঋষিরা ওদের বিষয়ে ঐ সব লিখে গেছেন!

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাস্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো! বোকার মতন মুখ করে থাকলে সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। পড়তো ওর ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো, তবে দেখা যেতো! যাই হোক, একদিনেই নাম করবার তার এমন কিছু তাড়াহুড়ো ছিলো না।

নগা বললে—"ব্যাটা খোশামুদে!"

ছেলেটা শুনে বললে, "ছিঃ, হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে।"

রাগে নগা হাতের মুঠো খুব তাড়াতাড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে লাগলো। গেলো বছর যদি ওর টাইফয়েড না হতো নিশ্চয় সেদিন একটা কিছু হয়ে যেতো।

এমনি করে কদ্দিন যেতে পারে! শেষটা একদিন গবুই এক বিষম ফন্দি বার করলো। গবুটা দেখতে রোগা পটকা, আর প্রত্যেক পরীক্ষায়, প্রত্যেক বিষয়ে লাস্ট হলে কি হবে, ছেলেটার খুব বুদ্ধি আছে। সেদিন ক্লাশে এসেই সে নগাকে কানে কানে কি বললো। তাই না শুনে উৎসাহের চোটে নগা অঙ্কটঙ্ক ভুল করে কোণে দাঁড়িয়ে একাকার! তাতে বরং একদিক দিয়ে সুবিধেই হলো,

নগা কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মতলবটা দিব্যি পাকিয়ে নিলো।

সেইদিনই টিফিনের সময় নটবরকে ডেকে নগা বললো, "ভাই নটবর, যা হবার তা হয়ে গেছে, একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, হেড-মাস্টারকে তাই একটু সাহায্য করা চাই। তুমি ক্লাশের ভালো ছেলে, তুমি বললে দেখাবেও ভালো, তা ছাড়া তোমার মতন গুছিয়ে কেই বা বলতে পারবে?"

নটবর খুশি হয়ে বললো—"তা তো বটেই! ক্লাশের অর্ধেক ছেলে তোতলা, আর বাকিগুলো একেবারে গবচন্দ্র।"

নগা আশ্চর্য রকম ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বললো —"তা, তুমি গিয়ে তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবে যে তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে তুমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সাহায্য করতে চাও। এই একটু সম্মান দেখাবার জন্য আর কি! বুঝলে তো? ভালো করে বুঝিয়ে বলো, এই কাল ওঁর বাবা মারা গেছেন কিনা।"

নটবর হাঁ করে শুনে বললো—"আহা, তাই নাকি? তোমরা ভেবো না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করে থাকলে ফল টের পাবে।" বলে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলো। তার ঐ 'টের পাওয়া'র কথাটা আমার ভালো লাগলো না। 'টের পাওয়া' বলতে আমরা অন্য মানে বুঝি। সে যাই হোক গে। ক্লাশের ঘণ্টা পড়বামাত্র নটবর ছুটতে ছুটতে এসে বললো— "হেডমাস্টার রাজী হয়েছেন। তোমাদের কজনকে এক্ষুনি ডেকে-ছেন কি সব কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তোমরা কি করে জানলে

তাও জিগগেস করছিলেন। মনে হলো খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা এক্ষুনি যাও।"

আমরা প্রথম তো অবাক! শ্রাদ্ধের কথাটা গবুর সম্পূর্ণ বানানো। কোথায় নটবর ইয়ার্কি দেবার জন্য মার খাবে, না সত্যি হেড-মাস্টারের বাপের শ্রাদ্ধ! এ রকম কিন্তু আরও হয়। আমি একবার একটা অচেনা ছেলেকে মজা দেখবার জন্য বলেছিলাম, "কি হে, চাটগাঁ থেকে কবে এলে?" সে বললো—"কাল এলাম, তুমি কি করে জানলে?" আমি অবিশ্যি আর কিছু ভেঙে বলিনি।

যাই হোক, আমরা তো গেলাম। দেখলাম হেডমাস্টার গোমড়া মুখ করে ফাস্ট ক্লাশের ছেলেদের ইংরেজি খাতায় লাল পেনসিলের দাগ কাটছেন। আমাদের দেখে খেঁকিয়ে বললেন—"কি, ব্যাপার কি তোমাদের? ক্লাশ নেই নাকি, এখানে যে বড় দঙ্গল বেঁধে এসেছো?"

নগা গলা পরিষ্কার করে বললো—"আজ্ঞে, আপনার বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। এই আমরা"—এইটুকু বলতেই হেডমাস্টারের এক ভীষণ পরিবর্তন হলো। মুখটা লাল হয়ে বেগুনি হলো, হাতের পেনসিলের মোটা সীস মট্ করে ভেঙে গেলো. গোঁফ-চুল সব খাড়া হয়ে গেলো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। তার চোটে শার্টের গলার বোতাম ফট্ করে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেলো। কি রকম একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলাম, এবার হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ হলো। নটবর আগাগোড়া মিছে

কথা বলেছে। হেডমাস্টার ডাকেননি। সে হয়তো দেখাই করেনি! হেডমাস্টার গর্জন করে উঠলেন, জানলার খড়খড়ি কেঁপে উঠলো। আমরা ছিটকে বাইরে এসে পড়লাম, তিনি ফেলে দিলেন কি আমরাই পালিয়ে গেলাম, আজও ঠিক জানি না। কাঁপতে কাঁপতে ক্লাশে ঢুকেই শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নটবরকে বলছেন, "সে কি নটবর, হেডমাস্টারের ভাইপো তুমি, সেকথা এদ্দিন বলোনি!"

নটবর বললে—"বাবা বলেন ও সম্পর্কটা কিছু ঢাক পেটাবার মতো নয়। তা ছাড়া ইস্কুলটা বাজে। এইমাত্র কাকাকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি তো রেগে কাঁই।"

এমন সময় দরোয়ান এসে বললো, "গবুবাবু আর ভোঁদাবাবুকে বেত খেতে হেডমাস্টারবাবু ডাকছেন।"

তাই শুনে পণ্ডিতমশাইও বললেন—"আব হ্যাঁ, বেত খেয়ে এসে আধ ঘণ্টা বেঞ্চে দাঁড়াবে, লেট করে ক্লাশে এসেছো।"

তাই বলি পৃথিবীটাই অসার!

টাকা চুরির খেলা

প্রথম যখন গণশার সঙ্গে আলাপ হলো সে তখন সদ্যসদ্য নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস থেকে নেমেছে। চেহারাটা বেশ একটু ক্যাবলা প্যাটার্নের, হলদে বুট পরেছে—তার ফিতেয় আবার দু'জায়গায় গিঁট দেওয়া; খাকি হাফ প্যান্ট, আর গলাবন্ধ কালো কোট—তার একটাও বোতাম নেই, গোটা তিনেক বড় বড় মরচে ধরা সেফটিপিন আঁটা। তার উপর মাথায় দিয়েছে সামনে বারান্ডাওয়ালা হলদে কালো ডোরা কাটা টুপি। দেখে হেসে আর বাঁচিনে।

ছোট কাকা সঙ্গে ছিলো, গণশার দাদাকে ডেকে বললো, " ওহে হরিচরণ, এটি আমার ভাইপো। তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মিলবে ভালো।" তাই শুনে গণশা রেগে কাঁই, "অত ছোট ভাই ছোট ভাই করবেন না মশাই। আর ঐ কুচো চিংড়িটার সঙ্গে মিলবো ভালো, শুনলেও হাসি পায়।"



ছোট কাকার মুখের রঙটা কি রকম পাটকিলে মতন হয়ে গেলো। ঢোঁক গিলে বললেন—"বটে!" সে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" অথচ শেষ অবধি ঐ গণশাকেই আমি বিষম ভক্তি করলুম।

সে এক মস্ত উপাখ্যান।

ছুটির দিন দুপুর বেলায় নিরিবিলি ছাদের ঘরের মেঝেতে বেশ আরাম করে উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটোকে উঁচুবাগে তুলে একটা চেয়ারের পায়াতে লটকে, দিব্যি করে নিজের মনে দাদার টিকিটের অ্যালবামে নতুন নতুন পাঁচ পয়সার টিকিট সারি সারি মারছি, কারু কোনও অসুবিধা করছি না, কিছু না, এমন সময়ে "ওরে গবা, গবা রে!" বলে বাপরে সে কি চিল্লানো! আর এরা আমায় কিনা বলে যে গোলমাল করি! সেই বিকট গোলযোগ শুনে তাড়াতাড়ি টিকিট অ্যালবামটা লুকিয়ে ফেলে নিচে যেতে যাবো, ভুলেই গেছি যে পা দুটো চেয়ারে লটকানো, তাড়াতাড়ি না টেনে নামাতে গিয়ে চেয়ার উল্‌টে গেলো, তার উপর দিদিটা হাঁদার মতন দুটো কাচের ফুলদানি রেখেছিলো, সে তো গেলো ভেঙে; সবচেয়ে খারাপ হলো : আমার আধ-খাওয়া পেয়ারাটা ছিটকে গিয়ে ঘরের কোণে পিসিমার গঙ্গাজলের হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গেলো।

এই সমস্ত ঘটনাতে আমার যে একেবারে কোনও দোষ ছিলো না একথা যে শুনবে সেই বলবে। অথচ এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে দাদা, দিদি, পিসিমা এমন হৈ-চৈ লাগালো, যেন তাদের ঘরে চোর সিঁদ কেটেছে! বাবা পর্যন্ত আমার দিকটা বুঝলেন না, বললেন—"দোষ করে আবার কথা!"

এর পর যখন ছোট কাকা গোলমাল শুনে দাড়ি কামাতে কামাতে এসে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বললো—"অনেক দিন থেকেই বলছি ও ঝুরি ভাজা ছেলেকে বিদেয় করো। তা তো কেউ শুনলে না। এখন জেলখানাতেও ওকে নিতে রাজী হবে না। সময় থাকতে নারাণবাবুর ইস্কুলে দিয়ে দাও, নইলে নাকের জলে চোখের জলে এক হবে।" মনে মনে বুঝলাম, ছোট কাকার নতুন শাদা জুতোয় সেই যে কলম ঝাড়বার সময়ে সামান্য তিন চার ফোঁটা কালি পড়েছিলো, ছোট কাকা এখনও সে কথা ভোলে নি। দিকগে বোর্ডিংএ, এদের চেয়ে খারাপ বোর্ডিংএ কেন নরকেও কেউ হতে পারে না। তাই রেগে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলাম—"তাই দাও না, তাই দাও না, তাই দাও না। এদিকে নিজে যখন বায়োস্কোপ দেখে দেরি করে ফিরে বাবার কাছে তাড়া খাও, তখন—"

বাবা বললেন—"চোপ্ !"

এরই ফলে ছুটির পর যখন ইস্কুল খুললো, আমি গেলুম নারাণ বাবুদের বোডিংএ। বেশ জায়গা, বাড়ি থেকে ঢের ভালো। প্রথমটা সকাল বেলা হালুয়া খেতে বিশ্রী লাগতো। তারপর দেখলাম ওতে খুব ভালো ঘুড়ি জুড়বার আঠা হয়। এ ছাড়া বোর্ডিং-এর আর সব ভালো। গণশাও দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে সে আমাদের ঘরে থাকে না।

প্রথম দিন শুতে গিয়ে দেখি আমাদের ঘরে ছ'জন ছেলে, পাঁচজন ছোট আর একজন বড়। আমাদের ঘরের বড় ছেলেটি ঠিক বড় নয়,

বরং মাঝারি সাইজের বললে চলে। কিন্তু তার তেজ কি! তার নাম পানুদা, তার কাজ নাকি আমাদের সামলানো, আর তাই করে করে নাকি তার ঠাণ্ডা মেজাজ খ্যাঁকখ্যাঁক করার ফলে দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানলুম পানুদা সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। নিয়ম করে ক্লাশের লাস্ট বয়ের ঠিক উপরে হয়। কিন্তু তার মন খুব ভালো, লাস্ট বয়কে খুব সাহায্য করে। আমাদের ঘরের নীলু বললো, সেই সাহায্যের ফলেই নাকি লাস্ট বয় বেচারা চিরটা কাল লাস্টই হচ্ছে!

যাই হোক, আমি এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করিনি, কারণ আমাদের ঘরে দেখতাম তার খুব বুদ্ধি খোলে। নিজে লুকিয়ে ডিটেকটিভ বই পড়তে আর আমরা কোনও অন্যায় করলে ধরে ফেলতে তার মতন ওস্তাদ আর দুটি হয় না। এই পানুদাই যেদিন বিপদে পড়লো, আমরা তো সবাই থ! সে এক অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার!

পানুদা আর তার গুটি পাঁচেক ক্লাশের বন্ধু প্রায়ই ভোজ মারে। সবাই মিলে টাকা জমিয়ে পানুদার কাছে দেয় আর এক শনিবার বাদে এক শনিবার চপ, কাটলেট, ডিমের ডেভিল—আরও কত কি'র ব্যবস্থা হয়! আমায় একবার একটা ঠোঙা ফেলতে দিয়েছিলো, আমি সেটা একটু শুঁকে আর একবার চেটে সারারাত "কি পেলুম না, কি পেলুম না" করে আর ঘুমুতে পারিনি।

পানুদার কাছে তো পিঁপড়েটি আদায় করা দায়, তাই আমরা ছোট ছেলেরা নিজেরা একবার পয়সা জমাতে চেষ্টা করেছিলাম।

সে আর এক কেলেঙ্কারি! জগা আজ চার আনা দিলো, আবার কাল বলে, "দে বলছি আমার চার আনা, আমি পেনসিল কিনবো।" যত বলি "পেনসিল কিনবি কি রে, ও দিয়ে যে আমরা চপ কাটলেট খাবো রে!" জগা বলে, "ইয়ার্কি করবার আব জায়গা পাসনি! দে বলছি, নইলে এইসা এক রদ্দা কষিয়ে দেবো!" পারলে বোধ হয় চাব আনার জায়গায় ছ'আনা নেয়। এমনি করে আমাদের সাড়ে তিন আনাব বেশি জমলোই না। তাও জমতো না, নেহাত মণ্টুর জ্বর-টর হয়ে বাড়ি চলে গেলো, আর পয়সাগুলো চেয়ে নিতে ভুলে গেলো।

যাই হোক, পানুদারা এদিকে সাড়ে তিন টাকা জমিয়েছিলো। রাত্রে শুনলাম পাশের খাট থেকে পানুদা বলছে—"আট আনার বরফি, আট আনার চিংড়ি মাছের কাটলেট, চার আনার ছাঁচি পান" —শুনে শুনে আমাব গা জ্বলতে লাগলো। জিভের জল গিলে গিলে পেটটা ঢাক হয়ে উঠলো।

পর দিনই কিন্তু পানুদা বিষম বিপদে পড়লো। লাইব্রেরিতে পানুদা আর সমীরদা আর কে যেন একটা ছেলে পেল্লায় আড্ডা দিচ্ছে, পানুদা চাল মেরে কি একটা কুস্তির প্যাঁচ দেখাতে গেছে আর স্লিপ করে কাচের আলমারির দরজা-টরজা ভেঙে চুরমার! পানুদা উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময়ে হেডমাস্টারমশাই এসে এমনি বকুনি লাগালেন যে পানুদা চমকে গিয়ে নিজের আলজিভ-টিভ গিলে বিষম-টিষম খেয়ে যায় আর কি! হেডমাস্টারমশাই এমনি রেগে গিয়েছিলেন যে এসব কিচ্ছু না

দেখে বললেন—"বাঁদুরে ব্যবসা ছেড়ে এখন মানুষের মতন ব্যবহার শেখো। তোমাকে বেশি জরিমানা কোত্থেকে আর করি, কিন্তু তোমার বাক্সে যা টাকাকড়ি আছে সমস্ত দিয়ে যতগুলি কাচ হয় কিনে দেবে, তা দিয়েও যে অর্ধেকের বেশি হবে তা তো মনে হয় না।"

সেদিন পানুদার মেজাজ দেখে কে! রাত্রে আমরা ঘরে বসে শুনলাম সিঁড়ি দিয়ে পানুদার চটির শব্দ—অন্যান্য দিনের মতন চটচট চটাং চটচট চটাং না হয়ে একেবারে চটাং চটাং চটাং! বুঝলাম পানুদা রেগেছে।

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দেখলাম আসলে আরও ঢের বেশি রেগেছে। ঘরে ঢুকেই পানুদা আমার আর কেষ্টর মাথা একসঙ্গে ঠুকে দিয়ে বললে—"অত হাসিহাসি মুখ কেন রে বেয়াড়া ছোঁড়ারা?" আমরা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেলাম। তারপর পানুদা জগার দিকে চেয়ে বললো, "ফের ফোঁস ফোঁস করছিস রাস্কেল?" বলে তার কানে দিলো এক প্যাঁচ। হীরু বললো, "ওর সর্দি হয়েছে কিনা—" পানুদা তার গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললো—"চুপ কর বেয়াদপ, তোর কে মতামত চেয়েছে?" তারপর সময় কাটাবার জন্য শিবুর কানের কাছে খোঁচাখোঁচা চুলগুলো নখ দিয়ে কুটকুট করে টানতে টানতে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে—"আজ তোদের কাছ থেকে যদি টুঁ শব্দটি শুনি, সব কটাকে কচুকাটা করে ফেলবো বলে রাখলাম।"

ঘরের মধ্যে একদম চুপ। পানুদা খাটে বসে পা দোলাতে লাগলো



আর বোধ হয় হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা ভাবতে লাগলো। এমন সময়ে সেই গণশাটা এসে হাজির। এসেই পানুদার পিঠ থাবড়ে এক গাল হেসে বললে—"কি রে পেনো, ফিস্টটা ভেস্তে গেছে বলে বুঝি মুখখানা হাঁড়ি আর কচি ছেলের উপর উৎপাত? রোজ বলি : ওরে পেনো, একা একা অত খাসনি!"

পানুদা গুম হয়ে রইলো।

গণশা বললো—"তাই বলে কি টাকাগুলো সত্যি দিবি নাকি ?"
পানুদা বললো, "দেবো না তো কি তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে ?"
গণশা হেসে বললে, "আরে রামঃ! এমন এক উপায় বাতলাতে এলুম, তোকেও দিতে হবে না, আমাকেও দিতে হবে না। আজ রাত্রে দরজা খুলে শুবি, দেখবি একটা ডাকাত এসে সব টাকা নিয়ে যাবে। পরে হয়তো ফিরে পাবি, কিন্তু ডাকাতটাকে খাওয়াতে হবে বলে রাখলুম।"

পানুদা হাঁ করে খানিক তাকিয়ে বললো—"সে দেখা যাবে এখন। এ সময়ে তুমি এ ঘরে যে বড় এসেছো, জানো না রুল থ্রি ?"

গণশা বললে—"সাধে শাস্ত্রে বলে কদাচ কাহারও উপকার করিও না।"

মুখে পানুদা যতই তেজ দেখাক না কেন, শোবার সময়ে দেখলুম দরজাটা ঠিক খুলে শুলো। অন্য দিন তো পারলে জানলাও বন্ধ করে, আমাকে দিয়ে খাটের নিচে খোঁজায়, রাত্রে উঠবার দরকার হলে জগাকে আগে একবার পাঠায়, আর সেদিন দেখি বেজায় সাহস! বালিশে মুখ গুঁজে একটু হেসে নিলাম।

উৎসাহের চোটে আমার অনেকক্ষণ ঘুম হয়নি, অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখি কে যেন টর্চের আলো ফেলেছে। পানুদা ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে আর বাকিরা কেউ যদি জেগেও থাকে ভয়ের চোটে চোখ বুজে পড়ে আছে। আমি দেখলুম কে একটা লোক পা টিপে টিপে এসে পানুদার বালিশের তলা থেকে চাবি বের করলো, পানুদার বাক্স খুললো, কি যেন নিলো, আবার বাক্স

বন্ধ করে চাবি বালিশের নিচে রেখে আস্তে আস্তে চলে গেলো। পরদিন সকালে ইস্কুলময় হৈ চৈ, পানুদার টাকা চুরি গেছে। হেডমাস্টারমশাই সবাইকে ডেকে যাচ্ছে-তাই করে বকলেন, সকলের বাক্স খোঁজা হলো। কোথাও কিছু নেই। গণশার বাক্সে তো এত কম জিনিস, এবং তাও এত নোংরা যে তাই নিয়ে গণশা বেজায় বকুনি খেলো।

সেদিন রাত্রে পানুদার হাসি হাসি মুখ।

আজ কাউকে কিচ্ছু তো বললোই না, এমন কি যে-পানুদা শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলে আমাদের শার্ট থেকে বোতাম কেটে নিজের শার্টে লাগিয়ে নিতো, সে নিজের থেকেই জগাকে দুটো আস্ত খড়ি দিয়ে ফেললো!

এমন সময়ে গণশা আবার ঘরে ঢুকলো।

"কি রে পেনো! শেষটা সত্যি ডাকাত পোলো তোদের ঘরে?"

পানুদা খুব হেসে বললো—"দিস ভাই, তোরও নেমন্তন্ন রইলো।"

গণশা যেন আকাশ থেকে পড়লো—"কি দেবো রে পেনো! বলছিস কি?"

"কেন, টাকা!"

"কিসের টাকা? টাকা আবার কোথায় পাবো রে? দান-ছত্তর খুলেছি নাকি? আর তা যদি খুলিও, তোকে টাকা দেবো কেন রে এতো যোগ্য লোক থাকতে?"

পানুদা ভয়ংকর চটে বললে—"দেখ গণশা, ইয়ার্কি ভালো লাগে না। দে বলছি!"

গণশা বললে—"ইয়ার্কি কি আমারই ভালো লাগে নাকি রে?"
তারপর গুনগুন করে গাইতে লাগলো—

"নিশুত রাতে চোরের সাথে টাকা চুরির খেলা,
ঐ চোর বেটা নিলে সেটা পেনো বুঝলো ঠেলা!"

সেই অবধি গণশাকে আমি ভক্তি করি।



ও পাড়ার মাঠে ফ্নটবল খেলে ফিরতে বড্ড সন্ধ্যে হয়ে গেলো। আমি আর গ্নপে দ্নজনে অন্ধকার দিয়ে ফিরছি খেলার গল্প করতে করতে, এমন সময় গ্নপে বললো—"ঐ বাঁশঝাড়টা দেখেছিস?" বলল্নম "কই?" সে বললে, "ঐ যে হোথা। মনে হয় ওখানে কি একটা লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিলো, না?"

গ্নপের দিকে তাকাল্নম, এমন সময়ে এমন কথা আশা করিনি। আমি বলল্নম, "গ্নপে, তুই কিছ্ন খেয়েছিস নাকি ?"

গ্নপে বললো, "চোখ থাকলেই দেখা যায়, কান থাকলেই শোনা যায়।" আমি বলল্নম, "নিশ্চয়ই। মাথা না থাকলে মাথা ব্যাথা হবে কি করে?" গ্নপে বললো, "তুই ঠিক আমার কথা ব্নঝলি না! দেখবি চল্ আমার সঙ্গে।"

বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। পেঁচোর মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। সেও সন্ধ্যেবেলা মাছ কিনে ফিরছে, বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময় কানের কাছে শুনতে পেলো, "পেঁ-চোঁর মাঁ, মাঁছ দেঁ!" পেঁচোর মা হনহনিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু সেও সঙ্গে চললো—"দেঁ ব'লছি, মাঁছ দেঁ!"

গুপে ক্লাশের লাস্ট বেঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোমহর্ষণ সিরিজের বিকট বই পড়তো। আমায় একটা দিয়েছিলো, তার নাম "তিব্বতী-গুহার ভয়ঙ্কর" কি ঐ ধরনের একটা কিছু। আমায় বলেছিলো, "দেখ্, রাত্রে যখন সবাই ঘুমুবে, একা ঘরে পিদিম জেবলে পড়বি। দেয়ালে পিদিমের ছায়া নড়বে, ভারি গা শিরশির করবে, খুব মজা লাগবে।" আমি কিন্তু একবার চেষ্টা করেই টের পেয়েছিলুম ওরকম মজা আমার ধাতে সইবে না। আজ আবার এই!

গুপে বললে, "কি ভাবছিস? চল্ দেখি গিয়ে। বাবার কে এক বন্ধু একবার দিল্লীতে একটা সেকেলে পুরনো বাড়িতে একটা শুকনো মরা বুড়ি আর এক ঘড়া সোনা পেয়েছিলেন। দেখেই আসি না। হয়তো গুপ্তধন পোঁতা আছে। যক্ষ পাহারা দিচ্ছে।" তারার আলোয় দেখলুম, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বল জ্বল করছে। তাই দেখেই আমার ভয় করতে লাগলো—আবার বাঁশঝাড়ের যক্ষ!

কিন্তু কি করি, গুপেটা আঠালির মতন লেগে রইলো। অগত্যা দুজনে অন্ধকার ঘন ঝোপের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে চললুম। গুপে আবার কি একটা মস্তকহীন খুনীর গল্প শুরু করলো।



কবে নাকি কোন পুরনো ডাকবাংলোয় কেউ রাত কাটাতে চাইতো না। লোকে বলতো, যারাই থেকেছে রাতারাতি মরে গেছে। কেউ কিছু ধরতে পারে না। বাবুর্চি বলে, "হাম তো মুরগী পকাকে আউর পরটা সেংককে সাবকো খিলাকে ঐ হামারা কোঠি চালা গিয়া। রাতমে কভি ইধার আতা নেই, বহুত গা ছমছম করতা, আউর যো সব কাণ্ড হোতা যো মালুম হোতা আলবত শয়তান আতা হ্যায়।"

শেষে কে এক সাহসী, মস্ত এক কুকুর নিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে

বসে রইলো, কি হয় দেখবে। কোথাও কিছু নেই, ঘর-দোর ঝাড়াপোঁছা পরিষ্কার। আশ্চর্য, দেয়ালে একটা টিকটিকি কি ঘুমন্ত মাছি অবধি নেই! অনেক যখন রাত, লেকটা আর জেগে থাকতে পারছে না, দেশলাই বের করেছে, সিগেরেট খাবে, কুকুর-টাও ঝিমোচ্ছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও কমে এলো....

গল্প বলতে বলতে আমাদের চারিদিকের আলোও কমে এসেছিলো, আর গুপের স্বর নিচু হতে হতে একেবারে ফিসফিসে দাঁড়িয়ে-ছিলো। আর তার চোখ দুটো আমার কপাল ছ্যাঁদা করে ভিতরের মগজগুলোকে ঠান্ডায় জমাট বাধিয়ে দিচ্ছিলো।

আমার গলা শুকিয়ে এলো, কান বোঁ বোঁ করতে লাগলো। নিশ্চয়ই মূর্ছা যেতাম, তারপর সেখান থেকে টেনে আনো রে, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি সামনেই বাঁশঝাড়। দেখে থমকে দাঁড়ালুম, অন্য একটা ভয় এসে কাঁধে চাপলো। বাঁশঝাড়ের মধ্যে স্পষ্ট শুনলুম, খপখপ শব্দ—যেন বুড়ো সাপ নিবিষ্ট মনে একটার পর একটা কোলা-ব্যাঙ গিলে যাচ্ছে।

গুপের দিকে তাকালুম, জায়গাটার থমথমে ভাব নিশ্চয়ই সেও লক্ষ্য করেছে। তার মুখটা অন্ধকারে শাদা মড়ার মতন দেখা-চ্ছিলো। জায়গাটাতে হাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভালো করে শোনা যাচ্ছিলো না।

আমার মনে হতে লাগলো—আর কখনও কি বাড়ি যাবো না? পিসিমা আজ মালপো ভেজেছেন। সে কি দাদা একা খাবে?

মাস্টারমশাইও এতক্ষণে এসে বসে রয়েছেন, হয়তো শক্ত শক্ত অঙ্ক ভেবে রাখছেন। আঃ, গুপেটা কেন জন্মেছিলো?

গুপে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললো, "চল্ কাছে যাই।" বাঁশঝাড়গুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো তারার আলোয় মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁকা। আশেপাশে ঘন বিছুটি পাতা, সে জায়গাটা শুকনো ঘাসে ঢাকা। থেকে থেকে দু'একটা বুনো কচুগাছ, বিষম ভূতুড়ে গাছ।

তারপর চোখ তুলে আর যা দেখলাম, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। মনে হলো ছেলেবেলায় একবার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি ঘরের আলো নিবে গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর তার মধ্যে খসখস শব্দ, যেন কিসে বসে বসে শুকনো কিসের ছাল ছাড়াচ্ছে! এত কথা মনে করবার তখন সময় ছিলো না, কারণ আবার ভালো করে দেখলাম দুটো শাদা জিনিস, মানুষের মতন, কিন্তু মানুষ তারা হতেই পারে না। জায়গাটা যে শাঁকচুন্নীর আস্তানা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। স্পষ্ট একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধও নাকে এলো। অন্ধকারে দেখলাম দুটো খুব লম্বা আর খুব রোগা কি, আপাদমস্তক শাদা কাপড় জড়ানো, মাথায় অবধি ঘোমটা দেওয়া, নড়ছে চড়ছে। দেখলাম তাদের মধ্যে একজন ছোট্ট কোদাল দিয়ে নরম মাটি অতি সাবধানে খুঁড়ছে, অন্যজন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়লো জ্যাঠামশাই একবার কলকাতায় পুরনো চক-মেলান বাড়িতে ছিলেন, সেখানে একদিন দুপুর রাতে

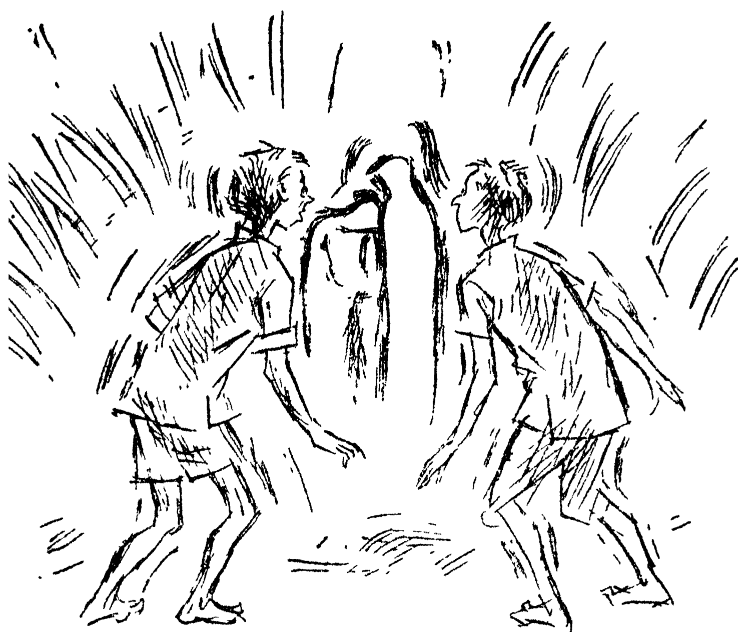
দিদিরা ভূত দেখেছিলো—কলতলায় গোছা গোছা বাসন মাজছে। তারপর থেকেই তো ছোড়দির ফিটের রোগ। কিছুই না, ভূতের কুদৃষ্টি!

আবার তাকিয়ে দেখি খোঁড়া শেষ হয়েছে, গভীর গর্ত মনে হলো। এতক্ষণ অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। ঘাড়ে মশা কামড়াচ্ছিলো, চুলের মধ্যে কাঠপিঁপড়ে হাঁটছিলো, আর পা বেয়ে কি একটা প্রাণপণে উঠতে চেষ্টা করছিলো। গুপের পাশে তো অনেকক্ষণ থেকে একটা গো-সাপের বাচ্চা ওত পেতে বসেছিলো। গুপে দেখছিলো না, আমি কিছু বলছিলাম না। ওকে কামড়াক, আমার ভালোই লাগবে।

সেই শাদা দুটো এবার উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা ভারি জিনিস অন্ধকার থেকে টেনে বের করলো। গর্তের পাশে একবার নামালো, মনে হলো ছালায় বাঁধা—মাগো কি!

একটা নতুন কথা মনে করে ভয়ে কাদা হয়ে গেলাম। এরা হয়তো ভূত নয়, খুনী-ডাকাত, কাকে যেন মেরে ছালায় বেঁধে গভীর অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে নিরিবিলি পুঁতে বাড়ি চলে যাবে। কেউ টের পাবে না।

ভাবলাম নিঃশ্বাস অবধি বন্ধ করে থাকি। তারা এদিকে কালো জিনিসটাকে পুঁতে এ ওর দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে লাগলো, কালো মুখে শাদা লম্বা লম্বা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠলো। তারপর তারা অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেলো।



সে সন্ধ্যের কথা কাউকে বলতে সাহস হয়নি, বিশেষত গ্নপে যখন বাড়ির দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে বললো, "কাউকে বলিস না, বুঝলি? কাল আবার যাবো, এর মধ্যে নিশ্চয় সাংঘাতিক কোনও ব্যাপার জড়িত আছে।"

আমি কথা না বলে মাথা নাড়লাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না জ্যান্ত বাড়ি ফিরছি!

পরদিন মনে করলাম আজ কিছুতেই গ্নপের কাছে যাবো না। এ তো ভারি আহ্লাদ! উনি শখ করে আগাড়ে বাগাড়ে ভূত

তাড়িয়ে বেড়াবেন আর আমায় ওঁর সঙ্গে ঘুরে মরতে হবে! কেন রে বাপু! শাঁকচুন্নী যদি অতই ভালো লাগে—একাই যা না। আমায় কেন? অনেক করে মন শক্ত করে রাখলুম, আজ কোনও মতেই যাবো না। এমন কি মেজদাদামশায়ের বাড়ি চন্ডীপাঠ শুনতে যাবো, তবু বাঁশঝাড়ে যাবো না।

সারাদিন গুপের ত্রিসীমানায় গেলুম না। ক্লাশে ফাস্ট বেঞ্চে বসলুম। টিফিনের সময় পন্ডিতমশাইয়ের কাছে ব্যাকরণ বুঝতে গেলুম। এমনি করে কোনও মতে দিনটা কাটলো। কিন্তু বাড়ি ফেরবার পথে কে যেন পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিলো! আঁতকে উঠে ফিরে দেখি গুপে! সে বললে—"মনে থাকে যেন সন্ধ্যেবেলা!"

হঠাৎ বলে ফেললুম, "গুপে, আমি যাবো না।"

সে একটু চুপ করে থেকে বললে, "ও বুঝেছি, ভয় পেয়েছিস। তা তুই বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমীর গল্প শোন্ গে, আমি কেলোকে নিয়ে যাবো। তোর চেয়ে ছোট হলেও তার খুব সাহস।"

বড় রাগ হলো, বললুম, "ওরে গুপে, সত্যিই কি ভয় পেয়েছি, ঝোপ-জঙ্গলে সাপখোপের বাসা তাই ভাবছিলুম। আচ্ছা, না হয় যাওয়াই যাবে।"

গুপে বললো, "তাই বল্!"

আবার চারদিক ঝাপসা করে সন্ধ্যে এলো। মাঠ থেকে ফিরতে গুপে ইচ্ছে করে দেরি করলো। সূর্য ডুবে গেলো, আমরাও

বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা হলুম। আজ আমি প্রাণ হাতে নিয়ে এসেছি, মারা যাবো তবু শব্দটি করবো না! বাঁশঝাড়ের কাছে এসেই গা কেমন করতে লাগলো। সত্যিই জায়গাটাতে ভূতে আনাগোনা করে। এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে এই মশা-ওয়ালা বাঁশঝাড়ে আড্ডা গাড়বার আমি কোনও কারণ ভেবে পেলাম না।

আজ তারার আলো একটু বেশি ছিলো, সেই আলোতে দেখতে পেলাম, তারা আবার এসেছে। ঠিক মানুষের মতন দেখতে, তবে পা উলটো কি না বুঝতে পারলাম না। মনে হলো এদের উলটো হয়ে গাছে ঝোলা কিছুই আশ্চর্য নয়।

তারা এ ওর দিকে তাকিয়ে শকুনের মতন হাসতে লাগলো। তারপর কোদাল বের করে ঠিক সেই জায়গাটা খুঁড়তে লাগলো। দম আটকে আসছিলো। কে জানে কি বীভৎস ভোজের আশায় ওরা এসেছে! খুঁড়ে সেই কালো জিনিসটা টেনে তুললো, দেখলুম ছালা নয়, চিত্তির আঁকা কলসী! ভাবলুম গুপ্তধন।

তারা কলসীর মুখ খুলতেই আবার সেই দুর্গন্ধ! নিশ্চিত কিছু বিশ্রী জিনিস আছে ওর মধ্যে! কিন্তু তারা খাবার কোন আয়োজন করলে না।

একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট খুদির মায়ের গলায় বললো, "হ্যাঁলা বাগদীবৌ, পদীপিসি ঠিকই বলেছিলো, দেখ্ না বাঁশঝাড়ে পুঁতে সুঁটকিগুলো কেমন মজেছে!"

গুপে একটা প্রচন্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শিউরে উঠলো।

বললো, "চল্, পৃথিবীতে দেখছি অ্যাডভেনচার বলে কিছু নেই!"

আমি তৎক্ষণাৎ বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

গুপে বাড়ির কাছে এসে বললো, "কোথায় মড়া, কোথায় গুপ্তধন আর সুঁটকিমাছ! আর কারু কাছে কিছু আশা করবো না।"

আমি কিন্তু ব্যাপারটাতে খুশি হলাম।

কিছু বললাম না, কেবল মনে মনে সংকল্প করলাম, "খোক্কসের হাতে বরং পড়বো, তবু গুপের হাতে কখনও নয়।"



হুঁশিয়ার!

যখন সামনের লোকটার লোমওয়ালা ঘেমো ঘাড়টার দিকে আর চেয়ে থাকা অসম্ভব মনে হলো, চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলাম। অমনি কার জানি একরাশি খোঁচা খোঁচা গোঁফ আমার ডানদিকের কানের ভিতর ঢুকে গেলো। চমকে গিয়ে ফিরে দেখি ভীষণ রোগা, ভীষণ লম্বা, ভীষণ কালো একটা লোক গলাবন্ধ কালো কোট পরে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার পিছনে আরও অনেক লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কোন পা জোড়া তার বুঝে নিতে আমার একটু সময় লাগলো। শেষটা টের পেলাম খুব সরু, খুব লোমওয়ালা, আর খুব কালো ঠ্যাং দুটো ওর। তায় আবার একজোড়া দাঁত-বের-করা ছেঁড়া চটি পরা, তার ফুটো দিয়ে নোংরা বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে।

এই লোকটা হাসি হাসি মুখ করে আস্তে আস্তে আমার কানের

মধ্যে থেকে তার গোঁফটাকে সরিয়ে নিতে নিতে বললো, "মনি-ব্যাগটা আরেকটু খামচে ধরুন, যা চোর-চামারের উপদ্রব!" লোকটার কথাগুলো যেন কত দূর থেকে এলো, কি রকম একটা হালকা ফিসফিস আওয়াজ। তার চোখ দুটোও যেন আর কিছুতেই গর্তের মধ্যে থাকছিলো না, একেবারে বেরিয়ে এসে আমার মনিব্যাগের ভিতরের খোপের মধ্যে পড়ে যেতে চাচ্ছিলো।

সবাই একজনের পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শেয়ালদা স্টেশনের ইণ্টার ক্লাশ টিকিট-ঘরের দিকে এগোচ্ছিলাম। খুব সাবধানে, কারণ একটু এক পাশে সরলেই ধাক্কার চোটে লাইন থেকে বেরিয়ে পড়বার ভয়। এমনি করে যখন খাঁচার ভিতরে বেশ কালো-কালো মেমসাহেবের কাছে পৌঁছলাম, তখনও টের পাচ্ছিলাম, পিছনে সেই লোকটার ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস আর আস্তে আস্তে গোঁফ-নাড়া।

লোকটা দেখলাম আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। মেম-সাহেবকে যখন টাকা দিলাম লোকটা ঝুঁকে ব্যাগের মধ্যে দেখতে দেখতে বললো—"চেঞ্জ গুনে নেবেন, বেটিরা ভারি ছ্যাঁচড়।" মেম রেগে এ-গাল থেকে ও-গালে চুইং-গামটা ঠুসে দিয়ে বললো—"চোপরাও বাবু।" তারপর লোকটা আমাকে সেই রকম যত্ন করে উপদেশ দিতে দিতে প্ল্যাটফর্মের দিকে নিয়ে চললো। একটা কলার খোসা আর কি যেন খানিকটা খুব কসরত করে এড়িয়ে বললো—"সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সবারটা গিলবার ফিকিরে আছে।" গেটের কাছে চেকার বাবু টিকিত

চিকিত করে টিকিট ছেঁটে দিলে পর আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। বললো—"এই যে গাড়ি"—অবিশ্যি সেটা বলবার কিছু দরকার ছিলো না।

আমার সঙ্গে একটা ইণ্টার ক্লাশ গাড়িতে ঢুকে আমার পাশে বসে বললো—"জিনিসপত্র আগলে রাখুন, সুটকেসটা দূরে রাখবেন না, নিজের সিটের তলায় রাখাই ভালো। এটা জেনে রাখবেন শিয়ালদা স্টেশন চোর-বাটপাড়ের আড়ত।" তারপর আমরা



দুজনেই জুতো খুলে পা তুলে আরাম করে বসলে পর বলতে লাগলো—"সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজে যতগুলো চোর-জোচ্চর দেখেছি সবগুলোকে একটার পেছনে একটা দাঁড় করালে এখান থেকে বোলপুর স্টেশন অবধি লম্বা একটা লাইন হয়।" এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম।

তখন সে আরও বলতে লাগলো, "আর ছিঁচকে চুরির জন্য তারা যে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও বুদ্ধি দেখিয়েছে, ভালো কাজে যদি লাগাতো এতদিনে ভারতবর্ষ উদ্ধার হয়ে যেতো।"

তারপর তার কালো কোটের পকেট থেকে একটা চারকোনা পানের ডিবে বের করে বললো—"গিরিডির মতন সভ্য শহরে, যে জায়গা সজ্জনের বাস বলে বিখ্যাত এমন শহরে, সেবার পুজোর সময়ে সচ্চিদানন্দ জ্যাঠামশায়ের পাজামা সুটের ইজের গা থেকে খুলে চোরে নিয়ে চলে গেলো, এর বেশি আর কি বলা যায়!"

আমি নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগলাম। আর সে গোটা দুই পান মুখে পুরে, একটু চুন দাঁতে লাগিয়ে বলে যেতে লাগলো—"গরমের জন্য বাইরে মাদুর পেতে, তায় চাদর বিছিয়ে, বালিশ মাথায়, চাদর গায়, পায়ের কাছে চটি, বালিশের নিচে হাতঘড়ি, মাথার কাছে জলের গেলাশ নিয়ে, ভগবানের নাম করে রোজকার মতন শুয়ে পড়েছেন। আর সকালে উঠে দেখেন কিনা চটি নেই, গেলাশ নেই, বালিশ নেই, হাতঘড়ি নেই, এমন কি পরনের ইজেরটা পর্যন্ত কখন যেন আস্তে আস্তে খুলে নিয়েছে!"

শুনে আমি আশ্চর্য হলাম।

তখন সে বললো—"কাউকে মশাই বিশ্বাস করা যায়? অরুণ বাবু ট্রেনে করে আসছেন। সেকেন কেলাশ গাড়ি, সঙ্গে উঠলেন দিব্যি খাকি প্যাণ্ট শার্ট হ্যাট পরা বাঙালী সাহেব। ক্যায়সা ভাব জমে গেলো দেখতে দেখতে। ইনি ওঁর বিস্কুট খেলেন, আবার উনি এঁর সিগারেট টানলেন। তারপর মুড়ি-সুড়ি দিয়ে দুজনে ঘুম। সকালে উঠে অরুণবাবু দেখলেন বাঙালী সাহেবও নেই, তার জিনিসপত্রও নেই, আর অরুণবাবুর সুটকেসও নেই।"

আমি একবার আমার সুটকেস ও পুঁটলিটা দেখে নিয়ে ঠ্যাং বদলে বসলাম। আর সে বাইরে এঁদো পুকুরে ধোপাদের কাপড় কাচা দেখতে দেখতে নিচু গলায় বলতে লাগলো :

"ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে পিসিমার কাছে থাকতাম। গ্রামের এক-ধারে বাঁশঝাড়ের কাছে খড়ের চালের বাড়ি। যেই না সন্ধ্যে হওয়া আর অমনি বাড়ির আর উঠোনের আনাচে কানাচে ভয়ভীতিরা ভিড় করে আসতো। বাঁশঝাড়ের শুকনো পাতা খসার শব্দ থেকে আরম্ভ করে আমাদের মেনি বেড়ালটার ক্যাঁক করে ইঁদুর ধরার আওয়াজটা পর্যন্ত সূর্য ডোবার পর কেমন যেন অন্য রকম লাগতো। আর পিসিমা শোবার আগে প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেকটা খিল ভালো করে দেখে নিতেন, বাক্স প্যাঁটরার উপর নানান ভাবে ঘণ্টা বাসন সব এমন করে সাজিয়ে রাখতেন যাতে একটু সরালেই সব দুমদাম পড়ে আমাদের কেন, পাড়ার অন্য লোকদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই সব করতে করতে পিদ্দিমের তেলটুকু পুড়ে যেতো আর আলো নিবে যেতো। পিসিমাও অমনি খচমচ করে

বিছানায় ঢুকতেন। মাঝে মাঝে ওঁর ঠাণ্ডা খড়খড়ে পা আমার পায়ে লেগে যেতো, আমি শিউরে উঠতাম। শুয়েই আবার পিসি-মার মনে হতো—কি হবে, খাটের তলা দেখা হয়নি, যদি কোনও ধূর্ত চোর ছোরা-হাতে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকে! আমাকে বলতেন—'এই, তোর একটা মার্বেল খাটের তলা দিয়ে গড়িয়ে দে না, ওদিক দিয়ে বেরোলে বুঝবো খাটের তলায় কেউ নেই।' ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যেতো, পিসিমা যা বলতেন তাই করতাম। একবার খাটের পায়ায় মার্বেল আটকে গেলো, আর সারারাত পিসিমা আর আমি জেগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। আর কখনও যদি পিসিমা আগে শুতেন আর আমাকে অন্ধকারে পরে শুতে হতো, খাটের তিন হাত দূর থেকে এক লাফ মেরে খাটে উঠে পড়তাম, যাতে খাটের তলায় লুকিয়ে-বসা বদমায়েশটা তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার ঠ্যাং ধরে টেনে নিতে না পারে। একদিন হিসেব ভুল হওয়াতে পিসিমার পেটের উপর ল্যান্ড করেছিলাম, আর পিসিমা আমার কানটান মলে বার বার বলতে লাগলেন যে উনি পষ্ট টের পাচ্ছেন ওঁর নাড়িভুঁড়ি সব এলিয়ে গেছে!"

এতটা বলে লোকটা একবার আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বললো —"ছোটবেলা থেকে এমনি আমার ট্রেনিং যে কোন শা—র চোরও আমার কাছ থেকে কানাকড়িটিও পায়নি! এই দেখুন নোটের তাড়া নিয়ে নির্বিঘ্নে যাচ্ছি!"

এই অবধি বলেই হঠাৎ সে এদিক ওদিক চেয়ে সটাং শুয়ে পড়ে



নাক ডাকাতে লাগলো। গাড়িতে আর যে দু'চারজন ছিল তারাও সবাই এক সঙ্গে নেমে গেলো। আর আমিও আমার যে দু'একটা কাজ ছিলো সেরে নিয়ে অন্য এক বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম ও একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভোর হয়ে এসেছে, চোখ ঘষে উঠে দেখি আমার সঙ্গীটি কখন জানি নেমে গেছে। তার কথা মনে উঠতেই আর তার চোরের ভয় মনে করতেই বেজায় হাসি পেলো। ঠিক এই সময় চোখে পড়লো বেঞ্চির তলায় আমার সুটকেস, পুঁটলি

ও চটি কিচ্ছু নেই। আছে কেবল তার সেই দাঁত বের করা ছেঁড়া চটি জোড়া!

ভীষণ রাগ হলো। ভণ্ড, জোচ্চোর, বকধার্মিক কোথাকার! রাগের চোটে হঠাৎ নিজের ট্যাঁকের উপর হাত পড়ে গেলো। ট্যাঁক খুলে দেখলাম, কাল রাত্রে লোকটা ঘুমিয়ে পড়বার পর তার বুক-পকেট থেকে যে নোটের তাড়াটা সরিয়েছিলাম—আমার সুটকেস ইত্যাদি চুরি যেতে পারে—কিন্তু সেটি ঠিকই আছে।

বেশ একটু খুশি মনে আবার শুয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠলাম।





শিবু, শিবুর মা, আর শিবুর বৌ তিন নম্বর হোগলাপট্টি লেনের দোতলায় তিনখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো।

একটা ঘরে শিবুর মা শুতো, সেটা সব থেকে বড় ও ভালো, কারণ বুড়ি ভারি খিটখিটে। আরেকটাতে শিবু আর শিবুর বৌ শুতো, সেটা মাঝারি সাইজের। আর সব থেকে ছোটটাতে শিবু, শিবুর মা আর শিবুর বৌ তিনটে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কানা তোলা বড় বড় কাঁসার থালায় ভাত খেতো, বড় বড় কাঁসার বাটিতে ঝোল খেতো, আর বড় বড় কাঁসার গেলাসে জল খেতো; কিন্তু নুন আর লঙ্কা রাখতো থালার পাশে সান বাঁধানো মেঝের উপর। আগে খেতো শিবু আর শিবুর মা, দরজার দিকে পিঠ করে পাশাপাশি বসে। তারা উঠে গেলে খেতো শিবুর বৌ, দরজার

দিকে মুখ করে। কিন্তু শিবুর বৌ সব থেকে বড় মাছটা নিজের জন্য তুলে রাখতো। শিবু জানতো না বলে রাগ করতো না।

শিবু রোজ রাত্রে খেয়েদেয়ে, মুখে একটা পান পুরে, একটা শাবল, একটা শেড লাগানো লণ্ঠন আর এক থলে হাতিয়ার হাতে নিয়ে চুরি করতে বেরুতো। কারণ শিবু ছিলো অসাধারণ সাহসী, পুলিশ টুলিশ দেখে কেয়ার করতো না। তা ছাড়া শিবু অসম্ভব রকম দৌড়তে পারতো, আর টিকটিকির মতন জলের পাইপ বেয়ে নিমেষের মধ্যে তিনতলায় উঠে যেতে পারতো!

যাই হোক, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শিবু নিজের ঘরে যেতো রেডি হবার জন্য, আর শিবুর বৌ অমনি রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ করে খেতে বসতো।

শিবুর মা নিজের ঘর থেকে ডেকে বলতো—"হ্যাঁরে শিবে! জামা ছেড়ে উঁচু করে ধুতি মালকোঁচা মেরে পরেছিস তো?"

শিবু বলতো—"সে আর তোমায় বলে দিতে হবে না।"

শিবুর মা বলতো—"গায়ে আচ্ছা করে তেল মেখে নিতে ভুলিস না।"

শিবু বলতো—"আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ!"

শিবুর মা তবু বলতো—"শাবল, লণ্ঠন, থলে সব নিয়েছিস?"

শিবু বলতো—"কি মুশকিল!"

তখন রান্নাঘর থেকে শিবুর বৌ ভাত-খাওয়া গলায় বলতো, "দেখে শুনে আনবে, ছেঁড়া ফাটা না হয় যেন।"

শিবু বলতো—"জ্বালালে দেখছি।"

আর শিবুর মা আর শিবুর বৌ একসঙ্গে বলতো—"দুর্গা দুর্গা! হরিনারায়ণ!"

শিবুও অমনি চট করে অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো।

শিবুর মা তখন নিজের ঘরে আবার ফিরে খাটের নিচে, ট্রাঙ্কের পিছনে, আনাচে কানাচে দেখতো সব জিনিস ঠিক আছে কি না। তার ঘরভরা কত জিনিস : রুপোবাঁধানো গড়গড়া, দাঁড়ানো ঘড়ি, গ্রামোফোনের চোং, মেম্‌দের হ্যাণ্ডব্যাগ, পাউডারের কৌটো—এই-সব। এদিকে চোর ছ্যাঁচোড়ের যা উপদ্রব!

বুড়ির ছিলো সজাগ ঘুম। শিবু বাড়ি ফিরতেই যেই সিঁড়ির আলগা রেলিংটা ক্যাঁচকোঁচ করতো, তার ঘুম যেতো ছুটে, আর যা কিছু ভালো জিনিস বুড়ি আগেই গাপ করতো!

বৌয়ের ওদিকে অ্যায়সা ঘুম যে সকালে চা তেষ্টা পেলে ঠেলা না দিলে ওঠে না। সেও উঠেই কতক জিনিস বাক্সে তোলে— মালা, আংটি, রুমাল, সিগরেট কেস। আর বাদ বাকি যা থাকে শিবু তাই বিক্রি করে সংসার চালায়।

তবে দিনে দিনে শিবুও চালাক হয়ে গেছে! সেও অর্ধেক জিনিস আগেই গছিয়ে আসে।

এমনি করে পুজোর সময় এসে গেলো।

মহালয়ার দিন। শিবু রাতে খেতে বসে ভাবছে যে একটা মোটা রকমের দাঁও মারতে না পারলে তো আর এই মা-টিকে আর গিন্নীটিকে ঠেকানো যাবে না।

এমন সময় একজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায়



ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। শিবুর বৌ অমনি জিভ কেটে ঘোমটা দিলো। লোকটার একটা চোখ আছে, আরেকটার উপর সবুজ একটা তাপ্পি মারা। নাকটা কার ঘুঁষি খেয়ে থ্যাবড়াপানা হয়ে গেছে, থুতনিটা বুলডগের মতন, মাথার চুলে কদমছাঁট, গায়ে একটা কালো হাফ-প্যাণ্ট আর শাদা হাতাওয়ালা গেঞ্জি। শিবুর তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সে জল খেয়ে, গেলাশটা থালার ঠিক মধ্যিখানে রেখে, লোকটিকে বললো—"গুপী! কি মনে করে?" গুপী কোনো কথা

না বলে ডান হাতের বকবার আঙুল বেঁকিয়ে শিবুকে ডাকলো। শিবু উঠে বাইরে গেলো। এতক্ষণ শিবুর মা ও শিবুর বৌ এক-হাত করে ঘোমটা দিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিলো, এবার তারা আবার এদিকে ফিরলো। শিবুর মা মস্ত এক গ্রাস ভাত মুখে পুরলো আর শিবুর বৌ নখ খুঁটতে লাগলো।

এদিকে গুপী শিবুর কানের কাছে মুখ দিয়ে জোরে জোরে ফিসফিস করে বললো—"শিবে তুই রাজা হবি! আজ তোর কপাল খুলে যাবেরে শা—! চিংড়িহাটার জমিদারের বাড়ি চিনিস তো? সেই যেখানে আমার মামাতো ভাই চাকরি করে? সেই যে দোতলার লোহার সিন্দুকে ইয়া ইয়া পায়রার ডিমের মতন মণিমুক্তো আছে! আজ কেউ বাড়ি থাকবে না। গিন্নী রেগেমেগে ছেলেপুলে, সেপাই, ডালকুত্তা আর বাপের বাড়ির গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। জমিদারবাবুও রেগেমেগে মাছ ধরতে চলে গেছেন। কাল সব ফিরে আসবে যে যার রাগ পড়লে। আজ রাতে বুঝলি কিনা—"

শিবু বললো—"গয়না নিয়েই না চলে গেছে?"

গুপী বললো—"সে তো শুধু বাপের বাড়ির গয়না, আসলগুলো এখানে!"

শিবু—"তোর তাতে কি?"

গুপী—"তুই কাজ বাগাবি, তিন ভাগ তোর। আমি খবর এনেছি, এক ভাগ আমার। রাজী?"

শিবু বললো—"রাজী।"

গুপী চলে গেলো।

মায়ের আর বৌয়ের উৎসাহ দেখে কে! "ওরে শিবে, দেরি করিস না! পায়রার ডিমের মতন দুটো একটা আমরা নেবো।"

শেষ পর্যন্ত তোড়জোড় করে শিবু বেরুলো।

গভীর রাত্রে চিংড়িহাটার চেহারা বদলে গেছে। বাড়িগুলো আরো কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে, মাঝের গলিগুলো আরও সরু, আরও লম্বা হয়ে গেছে। থেকে থেকে বিরাট ষাঁড় দিব্যি নিশ্চিন্তে



পথ জুড়ে শুয়ে আছে, অন্ধকারে তাদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানুষের সাড়া নেই, খালি পথের ধারে ডাস্টবিনের পাশে মড়াখেকো খেঁকী কুকুর পিছনের ঠ্যাঙের ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে আকাশের দিকে মুখ করে বিশ্রী করে ডাকছে। আকাশে একটু মেঘ, আর চারদিকে অন্ধকার।

এমন সময় শিবু এসে সেখানে পেঁছিলো।

মস্ত বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু শিবুর নাড়িনক্ষত্র সব জানা ছিলো। পিছন দিক দিয়ে গিয়ে উঠোনের পাঁচিল টপকে শিবু একগাদা ঘুঁটের উপর পড়লো। সামনে একটা কাঁচের জানলা, তাতে শিক দেওয়া নেই; অন্য দিন এখানে ডালকুত্তা বাঁধা থাকে।

শিবু তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করলো। বাঁ হাতে একটা আঠা লাগানো কাগজের একটা দিক জানলার কাঁচে সেঁটে দিলো, তারপর ডান হাতে একটা ন্যাকড়া জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা দিতেই কাঁচটা ভেঙে গেলো। কোনও আওয়াজ হলো না, ভাঙা কাঁচটা কাগজে আটকে ঝুলে রইলো। শিবু তখন সেই ফুটো দিয়ে হাত গলিয়ে ছিটকিনি তুলে জানলা খুলে ফেললো আর এক নিমেষে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

একেবারে নিঝুম ঘুটঘুটে অন্ধকার, শিবু খুব সাবধানে এগুতে লাগলো। আলোর ঢাকনিটা একটু তুলে দেখলো চওড়া শ্বেত পাথরের ছক কাটা বারান্ডা, তার এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে,

তার আবার ধাপে ধাপে খোঁচা খোঁচা কি সব গাছপালা পেতলের হাঁড়িতে বসানো।

জনমানুষের সাড়া নেই।

শিবু উপরে উঠবার জন্য সবে এক পা তুলেছে এমন সময়ে নাকে এলো কিসের একটা কেমন চেনা চেনা সোঁদা সোঁদা আঁশটে গন্ধ। শিবু ঘুরে দাঁড়ালো। তার মুখচোখের চেহারা অবধি বদলে গেলো। শিকার দেখলে বেড়ালের যেমন হয়।

নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে একেবারে ভাঁড়ার ঘরের সামনে হাজির। দরজায় মস্ত তালা মারা, কিন্তু শিকলির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা চোখ-ভোলানো একটা আট সেরি কাতলা মাছ ঝুলে রয়েছে।

শিবুর মন থেকে আর সব কিছু মুছে গেলো। এ যে সাত রাজার ধনের বাড়া কাতলা মাছ! শিবু কাতলা মাছের দড়ি কেটে নামিয়ে নিয়ে পিঠে ফেলে সোজা সদর দরজা খুলে, আবার সেটা সযত্নে ভেজিয়ে রেখে, একেবারে সটান তিন নম্বর হোগলাপট্টি।

সিঁড়ির ক্যাঁচকোঁচ শুনে শিবুর মা দৌড়ে এসে বললো—'কই, পায়রার ডিমের মতন?" তারপর মাছ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললো, "অ শিবে! এমনটি যে পনেরো বছর দেখিনি! সের দশেক হবে নারে?"

বৌও জেগে ছিল, ধুপধাপ করে দৌড়ে এসে বললো—"পায়রার ডিমের মতন সত্যি?" তারপর মাছ দেখে গালে হাত দিয়ে বললো



—"আরে বাবারে! এমনটি যে জন্মে দেখিনি! বড় বঁটিটা বের করতে হবে দেখছি !"

শিবু মাছটা তার হাতে দিয়ে বললো—

"তিন ভাগ আমার, এক ভাগ গুপীর। ও খবর এনেছে।"



"এই রে! বাক্স কি করেছি মনে পড়েছে"—বলে পদিপিসি তো চিরকালের মতো চোখ বুজলেন! কিন্তু সেই বাক্সের ফেরে পড়ে একশো বছর ধরে তাঁর বংশধরেরা : খেন্তিপিসি, সেজদাদামশাই, পাঁচুমামা : সবাই নাজেহাল। ডাকাত নিমাইখুড়োকে হামলা দিয়ে ধনরত্ন ভরা বাক্স পদিপিসি গভীর রাতে গরুর গাড়ি করে বাড়ি আনলেন, অথচ গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই বাক্স উধাও! পাঁচুমামার সঙ্গে প্রথমবার মামাবাড়ি গিয়ে সেই বাক্সের রোমাঞ্চকর অনুসন্ধান শুরু হলো। কিন্তু মুশকিল এই যে

বিপদ যখনই ঘনিয়ে আসে পাঁচুমামা তখনই বেশি ডোজে জোলাপ খেয়ে নেন। তাঁর সঙ্গে আর পরামর্শ চলে না. একাএকাই অজানার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় চিলের ছাতে, রান্নাঘরের অন্ধকার কোণটায়। অবশেষে কী আশ্চর্য ভাবেই না বাক্স মিললো, জ্বর ছাড়লো ঘাম দিয়ে!—এমন মজার অ্যাডভেনচার তোমরা কেউ কখনো পড়োনি। ভয় পাচ্ছে আবার হাসিও পাচ্ছে, শিরশির করছে আবার সুড়সুড়িও লাগছে—এযুগে এমন আশ্চর্য লেখা একমাত্র লীলা মজুমদারই লিখতে পারেন। সচিত্র দাম ২৲

